নাচের পুতুল ১
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

নাচের পুতুল (১)-৭৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

অশ্বপদশব্দ কানে যেতেই সজাগ হয়ে উঠলো দস্যুরাণী। কুহেলি পর্বতের মাঝামাঝি কোনো এক গুহায় সে বন্দী আছে। পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হলেও প্রচুর নয়। গুহার সামান্য ছিদ্রপথে কিছু আলো প্রবেশ করে গুহা মধ্যে কিন্তু বাতাস মোটেই প্রবেশ করে না। তবে বেঁচে থাকার মত যৎকিঞ্চিৎ বাতাস ঐ ছিদ্রপথে যাওয়া-আসা করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সে কারণেই আজও বেঁচে আছে দস্যুরাণী। মাথা তুলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দস্যুরাণী গুহার ঐ ছিদ্রপথে নিচে।

দস্যুরাণীর চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জমকালো পোশাক পরা দস্যু বনহুর তার জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত এগিয়ে আসছে পর্বতের গা বেয়ে উপরের দিকে।

আজ দস্যুরাণীর মনে রাগ হলো না, সে যেন দস্যু বনহুরের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলো। যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে ভোলাতে হবে,. তাকে বশ করে তারই দ্বারা মিঃ আহাদ চৌধুরীকে খুঁজে বের করতে হবে। নিশ্চয়ই আহাদ চৌধুরীকে সে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

ক'দিন অন্ধকারময় গুহায় বন্দী থেকে দস্যুরাণী হাঁপিয়ে উঠেছে। বাইরের আলো-বাতাস তার নিতান্ত প্রয়োজন।

দস্যুরাণী জানে, বনহুর তাকে মুক্তি দেবে না, কারণ সে নিজেও তাকে বন্ধী করে দুর্গম পাতাল গহ্বরে আটক করে রেখেছিলো। বনহুর কৌশলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৌশলে তাকে বন্দী করেছে এবং এই কুহেলি পর্বতে তাকে আটকে রেখেছে। আজ শুধু সেই নয়, তার প্রিয়জন মিঃ আহাদ চৌধুরীও এই কুহিলে পর্বতের কোনো গুহায় বন্দী আছেন বা

তাঁকে হত্যা করা হয়েছে...ও কথা মনে হতেই শিউরে উঠলো দস্যুরাণী, তার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হলো।

গুহার মুখ থেকে পাথরখণ্ড সরে গেলো।

বনহুর মাথা নিচু করে গুহামুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

দস্যুরাণী দাঁড়িয়ে ছিলো একপাশে।

বনহুর দস্যুরাণীকে লক্ষ্য করে বললো—রাণীজী, অভিবাদন গ্রহণ করো।

দস্যুরাণী মুখ না তুলেই বললো—বনহুর, তুমি আমাকে বন্দী করে রেখেছো এতে আমি দুঃখিত নই। যা চাইবে তাই দেবো, একটি কাজ আমাকে করে দেবে?

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দস্যুরাণীর মুখের দিকে। সে মনে করছিলো দস্যুরাণী তাকে তিরস্কার করবে, ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠবে তার কথায় কিন্তু কণ্ঠস্বর বড় কোমল মনে হলো তার কাছে।

বনহুর বললো—কি কাজ তোমার যা করে দিলে তুমি সব দিতে পারো?

আমি শুনেছিলাম তুমি মিঃ আহাদ চৌধুরীকে বন্ধু হিসেবে একদিন গ্রহণ করেছিলে?

হাঁ. কিন্তু এই কুহেলি পর্বতে তাঁর কথা কেন? কয়েক পা এগিয়ে আসে বনহুর।

দস্যুরাণী বলে—মিঃ চৌধুরীও বন্দী হয়েছেন। বনহুর, তুমি যদি তাঁকে মুক্ত করে আনতে পারো, তুমি যা চাইবে তাই দেবো।

মিঃ চৌধুরী বন্দী হয়েছেন, এ কথা এই কুহেলি পর্বতমালার কোনো এক গোপন গুহায় থেকে তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি এবং নিজের চোখে দেখেছি একদল অদ্ভুত লোক মিঃ চৌধুরীর ও আরও দু'জনকে বন্দী করে আমারই গুহার সম্মুখ দিয়ে ঐ উঁচু শৃঙ্গটার দিকে নিয়ে গেলো। বনহুর, আমি জানি না তাদের কি করা হয়েছে। বন্দী না করে যদি হত্যা করে থাকে না না, তা করেনি, করতে পারে না।

বনহুর, তুমিই আহাদ চৌধুরীকে রক্ষা করতে পারো...তুমিই পারো। যা চাইবে তাই পাবে...

সত্যি?

হ্যাঁ।

যদি বলি তোমাকে।

বনহুর, আমি জানি তুমি অন্যান্য দস্যুর মত নও।

না, যা জানো বা শুনেছো তা সত্য নয়।

তাহলে কি তুমি......

হ্যাঁ, আমি তোমাকে চাই, একান্ত নিজের লালসা পূরণ আশায় তোমাকে পেতে চাই...

না না, তা হয় না। তুমি অন্য কিছু চাও আমি সব দেবো। চোখেমুখে দস্যুরাণীর একটি নিঃসহায় ভাব ফুটে উঠেছে, কণ্ঠস্বর করুণ কোমল।

যার কণ্ঠস্বরে শত শত অনুচর মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যার নির্দেশে শত শত ব্যক্তি উঠছে বসছে, যার ভয়ে রায়হানের জনগণ প্রকম্পমান, সেই দস্যুরাণীর কণ্ঠস্বর এমন করুণ শোনাচ্ছে। হাসি পেলো বনহুরের, বললো—জানো তো রাণী, কোনো নারী কোনো দিন কোনো দুর্ধর্ষ পুরুষের কবল থেকে রক্ষা পায়নি?

কিন্তু আমি জানি তুমি তাদের মত নও।

এ বিশ্বাস তোমার হলো কি করে?

আমি প্রথম নজরেই তোমাকে চিনেছি বনহুর।

তবে কেন আমাকে বন্দী করেছিলে?

দস্যুরাণী নিশ্চুপ।

বনহুর বলে উঠে—জানি তুমি এর জবাব দিতে পারবে না, কারণ তুমি অন্যায় করেছিলে।

হাঁ, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার কাছে।

জানোনা দস্যুরাণী, বনহুর কোনোদিন দোষীকে ক্ষমা করে না?

আমি দোষ করেছি বনহুর, আমি অপরাধী, তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই...

দস্যুরাণী নতজানু হয়ে বনহুরের পাদমূলে বসে পড়লো।

বনহুর পিছিয়ে গেলো এক পা, তারপর হেসে বললো—আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি এক শর্তে, তুমি যদি রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমাকে দাও।

চমকে উঠে দাঁড়ালো দস্যুরাণী, দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো—রক্তে আঁকা ম্যাপ!

হাঁ, যা তোমার পিতা দস্যু মরেন মিঃ বার্ডকে হত্যা করে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো বা আত্মসাৎ করেছিলো।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো দস্যুরাণীর মুখমণ্ডল, কঠিন কণ্ঠে বললো—রক্তে আঁকা ম্যাপের কথা তুমি জানলে কি করে?

তোমার জীবনের কোনো কাহিনীই আমার অজানা নেই দস্যুরাণী।

বনহুর!

হাঁ রাণীজী, রক্তে আঁকা ম্যাপখানা সহজে আমার হাতে তুলে না দিলে আমি তোমাকে রেহাই দেবো না। তাছাড়া তোমার মিঃ চৌধুরীর সন্ধানও হবে না কোনোদিন। আমি বুঝতে পেরেছি, তাঁকে কুহেলি পর্বতের সবচেয়ে বড় শৃঙ্গ কুহেলিকার কোনো গহ্বরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

কুহেলিকা!

হাঁ, অতি উচ্চ এ শৃঙ্গ; হিমালয় পর্বতের চেয়েও অনেক বড়।

বনহুর, তুমি মিঃ চৌধুরীকে মুক্ত করে এনে দাও। কোথায় আছেন তিনি আমাকে বলো?

কথা দাও রক্তে আঁকা ম্যাপখানা তুলে দেবে আমার হাতে?

না, ওটা আমি দিতে পারবো না।

তাহলে তুমি নিজেও রক্ষা পাবে না, তোমার মিঃ আহাদ চৌধুরীর সন্ধানও তুমি পাবে না কোনোদিন।

বনহুর কিছু ফলমূল এবং শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো, ওগুলো বের করে রেখে উঠে দাঁড়ালো—যদি ওটা দাও তাহলে আমি তোমার মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করবো আর কুহেলিকা শৃঙ্গে মিঃ চৌধুরীর সন্ধান চালিয়ে দেখবো, নচেৎ নয়......

বনহুর বেরিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড পাথরখণ্ডখানা এসে গুহার মুখ বন্ধ করে ফেললো।

দস্যুরাণী থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রাইলো, চোখ দুটো তারও আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। আপন মনেই বলে উঠে দস্যুরাণী—না না, আমি কিছুতেই রক্তে আঁকা ম্যাপ দিতে পারি না, ওটা আমার দস্যু জীবনের সম্পদ...কিন্তু মুক্তি পাবো না...দস্যু বনহুর ওটা না পেলে আমাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না...মিঃ চৌধুরীর সন্ধানও হবে না...যে করেই হোক মিঃ চৌধুরীকে রক্ষা করতেই হবে...তাঁকে বিচিত্র মানুষগুলোর কবল থেকে রক্ষা করতে হবে...কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন তো...যদি তাঁকে হত্যা করে থাকে ওরা...না না, তাঁকে ওরা হত্যা করেনি, বেঁচে আছেন তিনি...আমি তাঁকে উদ্ধার করবোই...আমাকে যেমন করে হোক বের হতেই হবে...বনহুরকে কৌশলে ঘায়েল করতে হবে, নাহলে এখান থেকে বের হবার কোনো পথ নেই...

দস্যুরাণী মেঝেতে বসে মাথার চুলগুলো দু'হাতে টেনে ছিঁড়তে লাগলো। বনহুরের সদ্য নিয়ে আসা ফলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে।

ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, যা ফলমূল এবং শুকনো রুটি ছিলো সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো গত দিন থেকে। আজ যদি বনহুর এগুলো না আনতো তাহলে তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে কাটাতে হতো।

দস্যুরাণী রাগের বশে ফলমূলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো সেগুলো আবার কুড়িয়ে একত্রিত করলো। মনে পড়ছে আজ তার এমনি একদিনের কথা...যদিও সেদিন সে বন্দী ছিলো না। প্লেন দুর্ঘটনায় একটি সাগরের বুকে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভাসতে ভাসতে একটি অজানা দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলো। যখন সংজ্ঞা ফিরে এসেছিলো তখন দেখেছিলো সমুদ্রতীরে বিশাল

বালুকারাশির মধ্যে সে একা নিঃসঙ্গ। দস্যুরাণী উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো আর স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলো কি করে সে এই সমুদ্র তীরে এলো। ধীরে ধীরে মনে পড়লো, সে আর মিঃ আহাদ চৌধুরী বসেছিলো পাশাপাশি। ওরা দু'জনাই তাকিয়ে ছিলো প্লেনের পাশ দিয়ে উড়ে চলা হালকা মেঘের দিকে। অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিলো প্লেনখানার চারপাশে। তখন প্লেনখানা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী সিগারেট পান করছিলেন আর একমনে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে। দস্যুরাণীও যেমন সম্বিৎ হারিয়ে তাকিয়ে ছিলো।

হঠাৎ কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন মিঃ চৌধুরী—অপূর্ব!

দস্যুরাণী হেসে বলেছিলো—কি?

মিঃ আহাদ বলেছিলেন—তুমি!

দস্যুরাণীর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিলো, বলেছিলো—যাও, তুমি বড় দুষ্ট!

মিঃ চৌধুরী অলক্ষ্যে ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বসেছিলেন— ঐ উড়ে চলা মেঘগুলোর মত বুঝি?

হ্যাঁ, তুমি তাই ...হেসে বলেছিলো দস্যুরাণী।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনখানা কাৎ হয়ে গিয়েছিলো— তারপর সব এলোমেলো, কিছু মনে নেই। বিশাল বালুকারাশির মধ্যে বসে আছে শুধু সে, মিঃ চৌধুরী কোথায়? দস্যুরাণী উঠে দাঁড়ালো , দাঁড়িয়ে তাকালো দূরে অনেক দূরে, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ে না। শুধু রাশি রাশি বালুর স্তূপ। মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ আগুন ছড়াচ্ছে। দস্যুরাণী পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলো শুকিয়ে গেছে তার দেহের প্যান্ট সার্ট-টাই সবকিছু। মাথার ক্যাপখানা হারিয়ে গেছে সাগরের বুকে কোথায় কে জানে!

দস্যুরাণী সম্মুখে এগিয়ে চলেছিলো, দৃষ্টি তার সেদিন অন্বেষণ করে ফিরছিলো। তার সঙ্গী মিঃ আহাদ চৌধুরীকে কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ খুঁজেও তাঁকে পায়নি। ভয়ে দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়েছিলো সেদিন দস্যুরাণী। ধূ ধূ বালুরাশির মধ্যে সে একা, নিঃসঙ্গ। শুধু নিঃসঙ্গই নয়, ক্ষুধার্ত। পেটে আগুন জ্বলছিলো, পিপাসায় কণ্ঠ নাগাদ শুকিয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ ঐ মুহূর্তে তার নজরে পড়েছিলো, দূরে কিছু ধুলা বালির উপর মুখ থুবড়ে উবু হয়ে পড়ে আছে একটি লোক, শিউরে উঠেছিলো দস্যুরাণী— নিশ্চয়ই ওটা মিঃ আহাদ চৌধুরীর মৃতদেহ।

দারুণ উদ্বিগ্নতা নিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো দস্যুরাণীর মৃতদেহটার। দ্রুতহস্তে উল্টে ফেলে সে দেখতে পেয়েছিলো মিঃ চৌধুরীর নয়—তাদেরই প্লেনের একজন আরোহী যার দেহে মিঃ চৌধুরীর মতই পোশাক ছিলো। দস্যুরাণী আশ্বস্ত হয়েছিলো ঐ মুহূর্তে।

এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো।

দস্যুরাণী অজানা দ্বীপে বড় একা, নিঃসঙ্গ।

রাত বাড়ছিলো।

সমুদ্রের গর্জন আর দমকা বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ মিলে এক ভীষণ শব্দ হচ্ছিলো। দস্যুরাণী বালির স্তূপের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়েছিলো। আকাশে অসংখ্য প্রদীপ তাকে যেন সেদিন হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো।

কেমন যেন একটা ভয় হচ্ছিলো, মৃতদেহটা তো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে না, বুকটা টিপ্ টিপ করছিলো দস্যুরাণীর। সে দস্যুরাণী। যে দস্যুরাণী কত শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, কত মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে সে কত রাত কাটিয়েছে কিন্তু আজ তার এমন লাগছে কেন!

হঠাৎ দূরে অনেকগুলো, ঢাকের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো; ক্ষীণ সে শব্দ। দস্যুরাণী সজাগ হয়ে উঠে বসে তাকিয়েছিলো, সে দেখতে পেয়েছিলো দূরে বহুদূরে অগণিত মশালের আলো ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন সেদিকেই এগিয়ে আসছে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলো দস্যুরাণী, ভয়ও হচ্ছিলো তার মনে, না জানি ওরা কারা নিশ্চয়ই এই অজানা দ্বীপে সভ্য মানুষ ওরা নয়, হয়তো অসভ্য জাতি।

দস্যুরাণীর ধারণা মিথ্যা নয়।

অল্পক্ষণেই দস্যুরাণী মশালের আলোতে দেখতে পেয়েছিলো— আলোকগুলো অন্য কিছু নয়, মশাল এবং একজন জংলী সে মশাল হাতে এগিয়ে আসেছে।

কি ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা!

সমগ্র দেহে বিচিত্র লৌহ অলঙ্কার এবং পালকের পোশাক। অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ওরা এগিয়ে আসছে। দস্যুরাণীর সাহসী মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়েছিলো তখন। এখানে কোথায় লুকাবো তার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলো না সে।

ওরা আরও নিকটে এগিয়ে এসেছে।

একটা লোককে ওরা হাত পা বেঁধে বহন করে আসছে। তার পিছনে দু'জন বলিষ্ঠ জমকালো লোক খর্গ হাতে এগিয়ে আসছে, কি ভীষণ তাদের চেহারা!

দস্যুরাণী কুঁকড়ে গেছে একেবারে।

ওরা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। দস্যুরাণী ওদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে মশাল রয়েছে।

দস্যুরাণী দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে উবু হয়ে বসে থাকে। আজ তার মৃত্যু অনিবার্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জংলীরা তাকে দেখলে হত্যা না করে ছাড়বে না জানে সে।

জংলীরা একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে।

মশালের আলোতে সমুদ্রতীরের জমাট অন্ধকার হালকা হয়ে গেছে, সব স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

হঠাৎ জংলীদের নজর এসে পড়লো তার উপর। ওরা অদ্ভুত শব্দ করে এগিয়ে এলো তার কাছে। দস্যুরাণী তখনও হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে, কারণ এই মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে এটা সুনিশ্চিত জানে সে।

কিন্তু জংলীরা তাকে হত্যা করলো না।

ওরা দস্যুরাণীকে তুলে নিয়ে আনন্দে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলো সেদিন। জংলীদের সবাই মাটিতে মাথা রেখে প্রণামের মত অভিভাদন করেছিলো।

দস্যুরাণী বুঝতে পেরেছিলো তার দেহের সাদা ধবধবে চামড়াই আজ তাকে রক্ষা করেছে। ওরা তাকে সাগরের দেবী মনে করেছে এবং নেচে নেচে পূজা করছে। যে লোকটিকে ওরা হাত-পা বেঁধে নিয়ে এসেছিলো তাকে তারই সম্মুখে বলি দিয়ে রক্ত পান করলো ওরা। তারপর অগ্নিকুন্ড জ্বেলে। লোকটার দেহ পুড়িয়ে ভক্ষণ করতে লাগলো আনন্দের সঙ্গে। তবে ওরা মৃতদেহের দগ্ধ মাংষ ভক্ষণ করার পূর্বে তার সম্মুখে কিছু মাংস এনে রাখলো অতি সসম্মানে।

সেকি উৎকট দুর্গন্ধ, আজও দস্যুরাণীর সেই কথা স্মরণ হলে পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। দস্যুরাণীর মনে জাগে ঐ দিনের কথাগুলো...তার জীবনে কত বিপদ এসেছে, এতটুকু মুষড়ে যায়নি, আজও সে মুষড়ে পড়বে না, তাকে কঠিন হতে হবে। দস্যু বনহুর রক্তে আঁকা ম্যাপের সন্ধান পেয়েছে এবং সে ঐ ম্যাপখানা হস্তগক করতে চায়। তা হতে পারে না, রক্তে আঁকা ম্যাপখানা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না।

দস্যুরাণী যখন গভীরভাবে এসব কথা চিন্তা করছে তখন বনহুর কুহেলিকা শৃঙ্গের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। কিছুটা এগুতেই বনহুরের নজরে পড়েছিলো পর্বতের গায়ে এক জায়গায় কিছুটা শেওলা জন্মে আছে। শুধু শেওলা নয়, শেওলার বুকে কয়েকটা পায়ের ছাপ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারে, দস্যুরাণী তার কাছে মিথ্যা বলেনি। মিঃ আহাদ চৌধুরীকে তাহলে কোনো দুষ্ট লোক কুহেলিকা পর্বতের কোনো গুহায় বন্দী করে রেখেছে।

বনহুর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে পর্বতের কিছু সমতল কিছু ঢালু অংশ ধরে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। আরও কিছু অগ্রসর হতেই দেখলো বনহুর একটা জুতো পড়ে আছে।

বনহুর জুতোটা তুলে নিলো হাতে। মূল্যবান জুতো সেটা তাতে কোনো ভুল নেই। এ জুতো কি তবে মিঃ আহাদ চৌধুরীর? দস্যুরাণীর প্রিয়জন আহাদ চৌধুরী, জানে বনহুর। যেমন করে হোক উদ্ধার করতেই হবে তাঁকে।

বনহুর নিচে তাকিয়ে দেখলো। একপাশে গভীর খাদ, যদি কোনোক্রমে পা পিছলে যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে বনহুর। তার মনে তখন নানা চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে। জম্বুর জেলে অসংখ্য দুঃস্থ জনগণ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তাদের মেয়েদেরও নাকি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শয়তান আব্বাস হাজী নিজে এসব দুঃস্থ জনগণের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। হয়তো দুঃস্থ মহিলাগণের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতেও তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না। রাগে বনহুরের মুখ কঠিন হয়ে উঠে। কারা তারা যাদের টেলিফোন পেয়ে পুলিশ মহল নাচের পুতুল বনে গেছে? জম্বু ও ঝাঁমই শুধু নয়, পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই পুতুলনাচ শুরু হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য নেতা সেজে জনগণের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গদ গদ কণ্ঠে তারা বক্তৃতা আওড়াচ্ছে—আজ দেশের এ অবস্থা এজন্য দায়ী দুস্কৃতকারীরা, অচিরে সেইসব দুস্কৃতিকারীর শায়েস্তা করা হবে ইত্যাদি.. মাঝে মাঝে চোখে থুথু দিয়ে রুমালে চোখ মোছে তারা জনদরদী বন্ধুর মত......

বনহুর ভাবতে পারে না। এসব কথা এ মুহূর্তে চিন্তা করলে মিঃ চৌধুরীকে উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আরও একটি কাজ তাকে বিচিলিত করে তুলেছে, সে হলো দিপালীর উদ্ধার। বেচারী কি অবস্থায় কোথায় আছে কে জানে! সে জানে, তাকে উদ্ধার করার জন্য কান্দাই পুলিশ মহল আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সে কারণে শয়তানদল মিঃ হেলালীকে শাসিয়ে গেছে। দিপালীর দ্বারা তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে......বনহুরের মুখে এই মুহূর্তে হাসি ফুটে উঠে। সে জানে, দিপালীকে কেমন করে উদ্ধার করতে হবে। হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারা বাধা

পায়, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে দেখতে পায় দূরে বহু দূরে শৃঙ্গের মাঝামাঝি একটি সমতল জায়গায় দুটি জমকালো চেহারার লোক বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। তাদের দেহে বিচিত্র নক্সা আঁকা রয়েছে বলে মনে হয় তার।

বনহুর ওদের দৃষ্টি থেকে নিজকে গোপন করে নেবার জন্য এবার একটি বড় পাথরখণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। তারপর সে দেখতে লাগলো কোন্ পথে এগুনো যায়। ঐ স্থানেই কোনো গুহামধ্যে আটক করে রেখেছে তারা মিঃ চৌধুরীকে— বনহুর অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো।

অতি ভয়ঙ্কর স্থান দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হচ্ছে, কারণ ওরা যে স্থানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সে স্থানটি কুহেলিকা শৃঙ্গের ঠিক মাঝামাঝি অংশ। বনহুর ঐ অংশ থেকে প্রায় একশত ফুট নিচে রয়েছে। ওরা কোনোক্রমে দেখে ফেললো উঁচু থেকে তাকে বর্শা নিক্ষেপ করতে পারে। বর্শা নিক্ষেপ করলে মৃত্যু অনিবার্য। কারণ সরে দাঁড়াবার মত স্থান সেখানে নেই। একপাশে গভীর খাদ, অপর পাশে পর্বতের খাড়া দেয়াল।

বনহুর যাতে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় সেদিকে সতর্ক হয়ে এগুতে লাগলো। যে পথে বনহুর এই মুহূর্তে অগ্রসর হচ্ছে সে পথ অতি দুর্গম, ভয়ঙ্কর।

পর্বতের গায়ে মাঝে মাঝে শেওলা জমে শুকিয়ে আছে। বনহুর সেই শুকনো শেওলার চাপ ধরে একটু একটু করে এগুতে লাগলো কখনও হামাগুড়ি দিয়ে কখনও উবু হয়ে। সমস্ত দেহটা ওর ঘেমে নেয়ে উঠেছে তবু চলছে সে, কারণ মিঃ চৌধুরীকে বাঁচাতে হবে, উদ্ধার করতে হবে অসভ্য জংলীদের কবল থেকে। কে যেন বনহুরের কানে কানে বললো......যার জন্য তুমি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে এগিয়ে আছো, সেই মিঃ আহাদ চৌধুরী তোমাকেই সন্ধান করে ফিরছে,. কারণ তুমি দস্যুরাণীকে নিয়ে উধাও হয়েছো।

আপন মনে হাসলো বনহুর, কারণ তার কানে কানে যে কথা বলছে সে হলো তার বিবেক, তার মন।

বনহুর হেসে বললো—জানি ও কথা তোমাকে বলতে হবে না, কারণ আমার সন্ধানে এসেই তো সে বিপদে পড়েছে...তাইতো আমার চিন্তা বেশি...

আবার কানের কাছে শুনতে পেলো...তোমার সন্ধানে এসেই সে বিপদে পড়েছে যদি জানো তবে কেন তাকে উদ্ধার করার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছো...জানো তো সে তোমাকে পেলে ক্ষমা করবে না...

বনহুরের মুখে তেমনি মৃদু হাসির আভাস...সে আমাকে ক্ষমা না করলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো, কারণ এতবড় স্বনামধন্য একজন ডিটেকটিভকে আমি মরতে দিতে পারি না...

...কেন, কেন পারোনা? সে তোমাকেও রেহাই দেবে না, কারণ সে ডিটেকটিভ...তোমাকে গ্রেপ্তার করে সে সুনাম অর্জন করতে চায়..

...না, শুধু আমাকেই সে গ্রেপ্তার করতে চায় না, সে সমস্ত দুষ্কৃতিকারীকে শায়েস্তা করতে চায়; তাইতো আমি তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছি...কারণ সে পৃথিবীর দুঃস্থ মানুষের মঙ্গল চায়...

...তকে বাগে পেলে তুমিও রেহাই পাবে না...

...কিন্তু আমি সে সুযোগ তাকে দেবো না...

বনহুর ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, প্রায় ঐ লোক দু'টির পায়ের নিচে একটা সুড়ঙ্গের মত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে রয়েছে লোক দু'জন। এতটা পথ আসতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চুপসে গেছে।

বনহুর বসে পড়লো খানিকটা জিরিয়ে নেবার জন্য। কারণ এরপর তাকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ওদের দু'জনকে ঘায়েল করতে না পারলে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ওরা ঠিক পথ ধরেই পাহারা দিচ্ছে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে আগুন ধরালো। সবেমাত্র কয়েকমুখ ধূয়া নির্গত করেছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে কে যেন পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো তার গলাটা।

ভীষণ ঠান্ডা একটি বলিষ্ঠ বাহু বলেই মনে হলো বনহুরের কিন্তু ভালভাবে নজর করতেই শিউরে উঠলো, কারণ তার কণ্ঠ বেষ্টন করে আছে কোনো বলিষ্ঠ বাহু নয়, একটি কালনাগ।

ফণাটা ওর তুলে ধরেছে ঠিক মুখের কাছে।

লিক্‌লিক্ করছে ওর জিভটা। দুটো চোখ যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে।

বনহুর মুহূর্তে আঙ্গুল থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খপ্ করে দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো কালনাগের গলাটা। এত দ্রুত সে কাজ করলো যে, সাপটা তার কপালে ছোবল মারবার সুযোগ পেলো না।

ভীষণ জোরে চাপ দিতে লাগলো বনহুর সাপটার কণ্ঠনালীতে। যতই সে সাপটার কণ্ঠনালী চেপে ধরে চাপ দিচ্ছে ততই তার নিজের গলায় চাপ অনুভব করছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়েক আসছে বনহুরের, আর বুঝি রক্ষা নেই। বনহুর মরিয়া হয়ে ডান হাতে সাপটার কণ্ঠনালী চেপে ধরে বাম হাতে সাপটার দেহ হালকা করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

জমকালো পিছল বরফের মত ঠান্ডা কালনাগের দেহটা আরও এঁটে বসে যাচ্ছে বনহুরের গলায়। মুখ কালো হয়ে উঠেছে বনহুরের, আর বুঝি জীবন রক্ষা পেলো না তার।

বনহুর সাপ সহ উঠে দাঁড়ালো, শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি। ঠিক ঐ সময় প্রহরীদ্বয়ের নজরে পড়ে গেলো বনহুর।

একজন আর একজনকে লক্ষ করে অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো। সঙ্গে সঙ্গে দুজন একই সঙ্গে বর্শা তুলে ধরলো উঁচু করে।

বনহুরের গলা থেকে সাপটা হঠাৎ শিথিল হয়ে ছিটকে পড়লো নিচে, বনহুর দ্রুত হেলান দিলো পর্বতের দেয়ালে।

বর্শা দুটো একই সঙ্গে এসে ঠোকর খেলো বনহুরের দু'পাশে পাথরের গায়ে। মাটি হলে গেঁথে যেতো হয়তো বর্শার সম্পূর্ণ আগাটা। পাথরে ঠোকর খেয়ে বর্শা দুটোর মধ্যে একটি গিয়ে পড়লো হাজার ফিট নিচে, অপরটি পড়ে রইলো বনহুরের পায়ের কাছে।

লোক দু'জন বর্শা নিক্ষেপ করেই দ্রুত পর্বতের গা বেয়ে নিচে নেমে আসতে লাগলো। বনহুরকে ওরা দেখতে পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বনহুর সাপের সঙ্গে লড়াই করে হাঁপিয়ে পড়েছিলো। এবার সে পুনরায় লড়াইয়ের জন্য বর্শাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

হাঁপাচ্ছে বনহুর, নিশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছে; কারণ সাপটা ভীষণ শক্তিশালী ছিলো, ওকে কাবু করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলো সে।

ওরা পর্বতের গা বেয়ে অল্পক্ষণেই নেমে এলো একেবারে কাছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমনই একজন নাগালের মধ্যে এসেছে অমনি বনহুর তাকে লক্ষ্য করে হাতের বর্শা ছুড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে বর্শাখানা গেঁথে গেলো লোকটার বুকে। একটা তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা চিরে, পরক্ষণেই গড়িয়ে পড়তে লাগলো সে নিচের দিকে।

দ্বিতীয় লোকটা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। সঙ্গীর অবস্থা তাকে হয়তো ভীত করে তুললো। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, পরক্ষণেই সে নেমে আসছে দ্রুতগতিতে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো বর্শাবিদ্ধ লোকটা পর্বতের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই তার, কারণ জীবিত লোকটা হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে নেমে আসেছে। ওর বলিষ্ঠ মাংসবহুল দেহটা দুলে দুলে উঠছে।

লোকটা এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুররের উপরে। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক ঘুষি লাগালো ওর চেয়ালে। লোকটা ঘুরপাক খেয়ে উবু হয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে এলো দ্রুতগতিতে, বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আক্রমণ করলো তাকে।

শুরু হলো এবার লোকটার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ। একটু পূর্বে যেমন সাপটার সঙ্গে লড়াই হয়েছিলো বনহুরের তেমনি।

সে কি অসুরের শক্তি লোকটার দেহে।

বনহুর যেন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, বহুদিন সে এমন শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেনি। লোকটার হাতে কোনো অস্ত্র না থাকায় বনহুর নিজেও

কোনো অস্ত্র ব্যবহার করছে না, কারণ সে কোনোদিন নিরস্ত্রের প্রতি অস্ত্র ব্যবহার করেনি।

হঠাৎ লোকটা বনহুরের গলা চেপে ধরলো দু'হাতের মুঠায়। ভীষণ জোরে চাপ দিলো সে, কিছু পূর্বে কালনাগটা যেমনভাবে সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে ওর গলায় চাপ দিয়েছিলো ঠিক তেমনি।

বনহুর সুযোগ বুঝে ওর তলপেটে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা।

বনহুর ওকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ে ওর বুকের উপর। দু'হাতে চেপে ধরে ওর গলাটা। চাপ দিতে থাকে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের আঙ্গুলগুলো সাঁড়াশির মত বসে যায় লোকটার গলায়।

একটা যন্ত্রাণাসূচক শব্দ বেরিয়ে আসলো লোকটা কণ্ঠনালী দিয়ে, তার সঙ্গে বেরিয়ে এলো খানিকটা তাজা রক্ত।

বনহুর আরও জোরে চাপ দিতে লাগলো।

লোকটাও তার দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো বনহুরের গলার দিকে কিন্তু পারলো না। ওর হাত দু'খানা শিথিল হয়ে ঢলে পড়লো দু'পাশে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

তাকিয়ে দেখলো সে একবার নিচে গড়িয়ে পড়া বর্শাবিদ্ধ লোকটাকে তারপর পায়ের তলায় গলা টিপে হত্যা করা লোকটার মুখে।

বনহুর কিছু ভাবলো, তারপর নিজের দেহের পোশাক খুলে পরে নিলো নিহত লোকটার অদ্ভুত পোশাক। মাথার চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে এলোমেলো করে নিয়ে বর্শাখানা তুলে নিলো হাতে। ওপাশে পর্বতের গা বেয়ে ঝরণা বয়ে গেছে নিচের দিকে। বনহুর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জায়গার অনতিদূরেই সেই ঝরণাধারা বয়ে যাচ্ছে।

বনহুর অদ্ভুত পোশাক পরে ঝরণার ধারে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখে নিলো—না, চিনবার যো নাই। মুখের নানা স্থানে শেওলার সবুজ ছাপ তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছে।

বনহুর নিজের পরিধেয় বস্ত্র একটি ছোট্ট পাথরখণ্ডের নিচে লুকিয়ে রেখে বর্শাখানা হাতে নিয়ে কুহেলিকা পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। অত্যন্ত দুর্গম কঠিন পিছল পথ।

অক্লান্ত পরিশ্রমে বনহুর কুহেলিকা পর্বতের মাঝামাঝি এসে পৌঁছলো, যেখানে দাঁড়িয়েছিলো অদ্ভুত বিচিত্র পোশাকধারী দুটি প্রহরী।

বনহুর এবার সন্ধান করে চললো, নিশ্চয়ই এখানে আশেপাশেই আছে কোনো গোপন গুহা যেখানে আটক করে রাখা হয়েছে মিঃ চৌধুরীকে, যার জন্য দস্যুরাণীর এত উদ্বিগ্নতা।

বনহুর এদিক সেদিক সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলো। প্রত্যেকটা পাথরখণ্ডের আড়ালে লক্ষ্য করে এগুচ্ছে সে। হঠাৎ নজরে পড়লো বেশ কিছু দূরে একটা বড় পাথরের পাশে পড়ে আছে একটি জুতো। বনহুর দ্রুত এগিয়ে এসে জুতোটা তুলে নিলো হাতে। এ রকমই একটি জুতো সে দেখেছিলো কুহেলি পর্বতের কোনো এক জায়গায়। এ জুতোটাও তাহলে মিঃ আহাদ চৌধুরীর। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে সেই গুহা, যে গুহায় আছেন মিঃ চৌধুরী। জুতোটা দেখছে বনহুর, ঠিক ঐ সময় তার কানে এলো মানুষের কণ্ঠস্বর কারা যেন কথা বলছে, চাপা গম্ভীর কণ্ঠ।

বনহুর কান পেতে শুনলো।

ঠিক তার পায়ের তলা থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্য, তবে কি নিচে কোনো গহ্বর আছে? বনহুর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজতে লাগলো। বেশিক্ষণ তাকে খুঁজতে হলো না, অদূরে একটি বড় ফাটলের ধারে এসে দাঁড়াতেই স্পষ্ট তার কানে এলো একটি শান্ত কণ্ঠস্বর—রহমত, হতাশ হলে চলবে না, যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ মনকে দৃঢ় করো।

কিন্তু আর তো পারছি না। ক'দিন পানি পান না করে বাঁচা যায় বলুন! কথাগুলো হয়তো রহমত বললো।

পূর্বের সেই কণ্ঠ—মরতেই হবে তবু চেষ্টা করতে দোষ কি। এসো রহমত, ঐ ফাটলটা লক্ষ্য করে আমরা এগুতে থাকি..

কিন্তু কিভাবে এগুবো মিঃ চৌধুরী? এগুনোর কোনো পথ নেই—

বনহুর ঝুকে পড়লো ফাটলটার মুখে—না, কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু আওয়াজ ভেসে আসছে। কোন্ পথে ওদের ঐ গভীর গহ্বরে বন্দী করেছে কে জানে। বনহুর চিন্তা করলো কি করে ওদের উপরে তুলে আনা যায়।

হঠাৎ মনে পড়লো নিচে ঝরণার ধারে বেশ কিছুসংখ্যক মোটা লতাগুল্ম ঝুলছে, ঐ ঝুলন্ত লতা কেটে এনে নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে ওদের তুলে আনা যায়। বনহুর তাই করলো, আবার সে ফিরে এলো সেই ঝরণার পাশে। তার পোশাকগুলো যে পাথরখণ্ডের নিচে খুলে রেখেছিলো সেখান থেকে বের করে নিলো কোমরে বাঁধা বেল্টখানা। বেল্টের সঙ্গে ছোরা এবং রিভলভার ছিলো। বনহুর ছোরাখানা খুলে নিলো বেল্ট থেকে, তারপর ঝরণার নিচে ঝুলে থাকা লম্বা লতার বেশ কয়েকটা কেটে নিলো সে।

বনহুর যখন পুনরায় সেই কুহেলিকা শৃঙ্গের মাঝামাঝি সমতল স্থানটির পাশে এসে দাঁড়ালো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে।

দ্রুতহস্তে বনহুর ঐ লতা দড়ির মত পাকিয়ে নিয়ে ফাটলের মধ্যে নামিয়ে দিলো।

মিঃ আহাদ চৌধুরী দেখলেন, প্রথমে তিনি সাপ বা কোনো একটা প্রাণী মনে করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন কেউ তাদের উদ্ধারের জন্য হয়তো চেষ্টা নিয়েছে। তিনি রহমত ও অপর ব্যক্তিকে বললেন—তোমরা ঐ লতায় তৈরি দড়ি বেয়ে উঠে যাও উপরে, মনে হচ্ছে কেউ না কেউ আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে চায়।

রহমত বললো—আমি যাচ্ছি, আপনারা আসুন।

তাদের সঙ্গী সেই ব্যক্তি যাকে মিঃ আহাদের সঙ্গে ওরা বন্দী করে এনেছিলো, সে বললো—ওটা কোনো শত্রুর কাজও হতো হতে পারে? আমাদের এই গহ্বর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করবে—

হেসে বললেন মিঃ আহাদ—মৃত্যু যখন আমাদের নিশ্চিত তখন নতুন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে লাভ কি? ক'দিন পানি এবং খাদ্য না খেয়ে আমরা বাঁচতে পারবো বা পারি। বেশ, আপনারা পরে আসুন, প্রথমে আমার উপরই আসুক।

মিঃ আহাদ কোনো কথা বললেন না, শুধু মাথা কাৎ হয়ে সম্মতি জানালেন।

এতক্ষণও তবু সামান্য কিছু কিছু নজরে পড়ছিলো, এখন সব নিকষ কালো হয়ে এসেছে। রহমত লতাপাতার দড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরের দিকে।

বিপুল উদ্বিগ্নতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী এবং তার সঙ্গী ভদ্রলোকটি। না জানি রহমতের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

কয়েক মুহূর্ত, তারপর লতাগুল্মের দড়িখানা নেমে এলো নিচে। যদিও দড়িখানা স্পষ্ট নজরে পড়ছে না তবু আন্দাজ করা যায়।

ওরা জানে না রহমতের কি অবস্থা হয়েছে তবু মিঃ আহাদ বললেন—আপনি পরে আসুন, আমি আগে যাই।

ভদ্রলোক বললেন—না, আপনি অপেক্ষা করুন আমি আগে যাই। মৃত্যু যদি হয় আমারই হোক, আপনি পরে আসুন।

মিঃ আহাদ তাকে বাধা দিলেন না।

ভদ্রলোক উঠে গেলেন লতার তৈরি দড়ি বেয়ে।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিঃ আহাদ। এবার তার পালা, যা ঘটেছে তার সঙ্গীদ্বয়ের ভাগ্যে তাঁর ভাগ্যেও তাই ঘটবে। তবে মৃত্যুভয়ে ভীত নন মিঃ আহাদ চৌধুরী, জীবনে তিনি বহুবার মৃত্যুকে জয় করেছেন এবার না হয় পরাজিত হবেন।

প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে তাঁর এক একটি যুগের মত।

নেমে এলো লতার দড়ি।

এবার মিঃ আহাদের পালা।

দড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন মিঃ চৌধুরী। হাত দু'খানা এখন মুক্ত বটে তবে এখনও ব্যথায় টনটন করছে, কারণ বেশ কয়েকদিন ধরে তাদের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা ছিলো।

উপরে উঠে আসতেই মিঃ আহাদের দেহখানা শীতল বাতাসে পুলকিত হয়ে উঠলো, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন যারা দু'জন পাহারায় ছিলো তাদেরই একজন লতার তৈরি দড়ি নামিয়ে তাদের তুলে এনেছে উপরে পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে আরও দেখলেন, রহমত ও তাদের সঙ্গী ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন, কোনো বিপদ ঘটেনি। তাদের দেখে খুশি হলেন মিঃ আহাদ। এবার তিনি তাকালেন যার হাতে লতার তৈরি দড়িখানা রয়েছে তার দিকে।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে মিঃ আহাদ চৌধুরী তাকালেন কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে বিচিত্র ধরনের পোশাকধারী জংলীবেশী বনহুরের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় না হলে হয়তো মিঃ আহাদ চৌধুরীর চোখে ধূলো দেওয়া বনহুরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো, কারণ জংলীদের দেহের বর্ণ ছিলো কালো আর বনহুরের বর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়াও বনহুরের চোখ দুটো ছিলো অদ্ভুত ধরনের সুন্দর দীপ্তময়। সহজে সবার দৃষ্টি এড়ানো বনহুরের সহজ হলেও মিঃ আহাদ চৌধুরীর দৃষ্টি সে কিছুতেই এড়াতে পারতো না।

বনহুরের হাতে হাত রেখে মিঃ আহাদ বললেন—বিদায় বন্ধু তোমার মঙ্গল হোক—

বনহুর শুধু মাথা নত করে সম্মতি জানালো।

মিঃ চৌধুরী তার সঙ্গীদ্বয় সহ নেমে চললেন পর্বতের গা বেয়ে।

দূরে দাঁড়িয়ে রইলো জংলীবেশী দস্যু বনহুর, তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। জানে সে, মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুরের সন্ধানেই পাড়ি জমিয়েছে অজানার সন্ধানে, কারণ তার দস্যুরাণীকে হরণ করে নিয়ে গেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিঃ চৌধুরী যখন সঙ্গীদ্বয় সহ পর্বতের গা বেয়ে অতি সাবধানে নিচে নেমে চলেছেন তখন বনহুর আসে সেই পাথরখণ্ডের পাশে, যে পাথরখণ্ডের নিচে লুকানো ছিলো তার পরিধেয় জমকালো পোশাক।

মিঃ চৌধুরী ভাবছেন জংলী প্রহরীটি সত্যিই মহৎ ব্যক্তি। তার দয়ার সীমা নেই। যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি বা পারলো না তবু তার মধ্যে রয়েছে একটি উদার প্রাণ।

তাঁরা রাতের অন্ধকারে অতি কষ্টে, অতি সাবধানে নিচে নেমে চললেন। অবশ্য ইচ্ছা করলেই তাঁরা পর্বতের কোনো সমতল জায়গায় রাতটুকু কাটাতে পারতেন কিন্তু মিঃ চৌধুরী জানেন, রাত ভোর হলে তারা আবার সেই বিচিত্র জংলীদের কবলে পড়তে পারেন, কাজেই রাতের অন্ধকারে সরে পড়াই সমীচীন মনে করলেন। তিনি জানেন না পিছনে পড়ে রইলো তার আকাঙ্ক্ষিত জন, যাকে তিনি খুঁজে ফিরছেন।

কুহেলি পর্বতের পাদমূলের কাছাকাছি পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আহাদের কানে ভেসে এলো অশ্বপদশব্দ। কেউ যেন দ্রুত অশ্ব চালনা করে চলে যাচ্ছে দূরে অনেক দূরে।

অন্ধকারে কিছু চোখে না পড়লেও কানে শুনতে পেলেন। বিস্মিত হলেন মিঃ আহাদ, গভীর রাতের অন্ধকার ভেদ করে কে সে অশ্বারোহী চলে যাচ্ছে দূরে?

এক সময় ভোর হয়ে এলো, তখন মিঃ আহাদ চৌধুরী সঙ্গীদ্বয় সহ কুহেলি পর্বতের পাদমূল ছেড়ে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন।

হঠাৎ রহমত বলে উঠলো—মিঃ চৌধুরী, দেখুন দেখুন মাটিতে অশ্বপদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মিঃ আহাদ এবং তার সঙ্গী ভদ্রলোক ভূপৃষ্ঠে লক্ষ্য করলেন, রহমতের কথা সত্য। তাঁরা দেখতে পেলেন ভিজে মাটির বুকে অশ্ব-খুরের চিহ্ন।

মিঃ আহাদ বললেন—কিছু পূর্বে আমরা যে অশ্ব পদশব্দ শুনেছিলাম সেই অশ্বারোহী এই পথেই চলে গেছে। না জানি কে সে ব্যক্তি।

রহমত বললো—আমার মনে হয় কোনো জংলীদলপতি ঘোড়া নিয়ে এ পথে চলে গেছে।

মিঃ আহাদ বললেন—জংলী দলপতিরা সহেজ ঘোড়া ব্যবহার করে না, তারা পদব্রজেই সচরাচর চলফেরা করে থাকে। তবে হতেও পারে...

ঠিক ঐ সময় বলে উঠেন সঙ্গী ভদ্রলোক—দেখুন ওটা কি? ভদ্র-লোকই এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নেন একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

মিঃ আহাদ দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে সিগারেটের টুকরাটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—এ স্থানে সিগারেট এলো কিভাবে?

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আমিও তাই ভাবছি। তবে কি সেই জংলী অশ্বারোহী সিগারেট পান করে?

মিঃ আহাদ তখনও সিগারেটের টুকরাটা ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন, তিনি বললেন—রহমত, শুধু সিগারেট নয়, এটা অতি মূল্যবান সিগারেটের টুকরা যা সাধারণ ব্যক্তি পান করার সুযোগ পায় না। যে ব্যক্তি এই সিগারেট পান করেছেন তিনি কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমতের মুখমন্ডলে ফুটে উঠলো চিন্তার ছাপ। ভদ্রলোকটি বললেন—জংলীরা এমন মূল্যবান সিগারেট কোথায় পাবে?

মিঃ আহাদ বললেন—নিশ্চয়ই কোনো গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে এই সিগারেটের টুকরার সঙ্গে।

আবার পথ চলতে শুরু করলেন মিঃ আহাদ এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়।

মাঝে মাঝে অশ্বখুরের দাগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিঃ আহাদ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের লক্ষ্য পথের দু'পাশে। পথ তো নয় প্রান্তর, চারিদিকে শুধু ছড়ানো পাথরখণ্ড আর ছোটবড় আগাছার ঝাড়।

কিছুদূরে এগুতেই কঠিন মাটির স্তর, কাজেই অশ্বপদচিহ্ন আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কোন্ পথে অশ্বারোহী অন্তর্ধান হয়েছে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। মিঃ আহাদ বললেন—অশ্বরোহী অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি!

মিঃ আহাদের কথায় বললো রহমত—কি করে আপনি অনুমান করলেন অশ্বারোহী অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি?

কারণ দক্ষিণ দিকের ফাঁকা পথে না গিয়ে অশ্বারোহীর পাথুরিয়া মাটি ধরে অন্তর্ধান হয়েছে। অশ্বারোহী চায় না তার পথের ছাপ ধরে কেউ অগ্রসর হয়। গভীর একটা চিন্তাযুক্ত ভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর চোখেমুখে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছেন মিঃ আহাদ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়। আজ কয়েকদিন তাঁরা অসহায় ছিলেন। পিপাসায় পানি ও পাননি।

অবশ্য গহ্বর থেকে বেরুনোর পর ঝরণা থেকে পেট পুরে পানি পান করে নিয়েছিলেন তাঁরা। সে জন্যই বোধ হয় এতটা পথ হেঁটে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবার যেন পা চলতে চাইছে না।

রহমত বললো..মিঃ চৌধুরী, আর যে চলতে পারছি না, বিশ্রামের প্রয়োজন, কারণ ক'দিন উপবাসে পেটের নাড়িভুড়ি হজম হয়ে গেছে—

সঙ্গী ভদ্রলোকটির অবস্থা আরও কাহিল।

তিনি তো পা তুলতে পারছিলেন না, বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

মিঃ আহাদ নিজেও যে সবল ছিলেন না তা নয়, কারণ তিনিও তো ক'দিন অভুক্ত। তবু তিনি সহ্য করছিলেন, না করেই বা কি করবেন!

কুহেলি পর্বত ছেড়ে তাঁরা অনেক দূর এসে পড়েছেন। অদূরে একটি বৃক্ষ। বৃক্ষটির নাম অজানা হলেও বেশ ছায়াঘন শাখা পরিবেষ্টিত। মিঃ আহাদ ঐ বৃক্ষটির নিচে এসে দাঁড়ালেন।

রহমত এবং সঙ্গী ভদ্রলোকটিও এসে দাঁড়ালো তার পাশে। মিঃ আহাদ বললেন—এখানে বিশ্রাম করবো, আপনারা বসুন।

ভদ্রলোক বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, এবার তিনি এবং রহমত বসে পড়লেন। অন্যান্য দিনের চেয়ে সূর্যের তাপটা যেন আজ বেশি বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ আহাদের সুন্দর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ছাপ, তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে গাছটার শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—রহমত!

বলুন মিঃ চৌধুরী?

তুমি গাছে উঠতে পারো?

পারি।

ঐ দেখো গাছে সুন্দর ফল পেকে আছে। পেড়ে আনো যদি খাওয়া যায় তাহলে...

কিন্তু...

বলো কিন্তু কি?

যদি বিষাক্ত ফল হয়?

মিঃ আহাদ এত কষ্টের মধ্যেও হেসে বললেন—একজন না হয় মৃত্যু বরণ করে ফল চেখে নেওয়া যাবে।

রহমত বললো—ক্ষুধায় এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না, পথ চলাতো দূরের কথা?।

কাজেই মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ফলগুলো সুমিষ্ট না বিস্বাদ পরীক্ষা করে দেখতেই হয়। ভদ্রলোক কথাগুলো ক্ষীণ শুষ্ক কণ্ঠে বললেন।

মিঃ আহাদ বললেন—হাঁ, ঠিকই বলেছেন বন্ধু; মৃত্যু আমাদের অনিবার্য, কারণ কয়েকদিন আমরা উপবাসী—বড় জোর আরও দু'দিন কাটাতে পারি কিন্তু দু'দিন পর যে খাদ্য এবং পানীয় পাবো তাও কোনো সঠিক নেই, কাজেই এই ফলগুলোই আমাদের সম্বল মনে করে নিতে হবে।

রহমত প্রস্তুত হয়ে গাছে উঠে পড়লো। অসংখ্য পাকা ফল গাছের ডালে ডালে ঝুলছে। মিঃ আহাদ বললেন—ফলগুলো স্বাদে কেমন হবে জানি না তবে বিষাক্ত নয় বলেই মনে হচ্ছে, কারণ ঐ দেখুন পাকা কয়েকটা ফল বাদুড় খেয়ে রেখেছে।

রহমত গাছের ডালে বসে দেখতে পেয়েছিলো কতকগুলো ফল বোঁটার সঙ্গে ঝুলছে, তার কিছু কিছু অংশ বাদুড় খেয়েছে।

রহমত কিছু পাকা ফল ছিঁড়ে নিয়ে ফেলে দিলো নিচে।

মিঃ আহাদ এবং তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক ফলগুলো কুড়িয়ে রাখলেন এক জায়গায়।

ফলগুলো থেকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ বের হচ্ছে।

মিঃ আহাদ বললেন—ফলগুলো নিশ্চয়ই খাদ্যোপযোগী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ততক্ষণ রহমত অনেকগুলো ফল পেড়ে নিয়েছে, এবার সে নেমে আসে গাছ থেকে।

মিঃ আহাদ বললেন—আমি সর্বপ্রথম ফল খাবো।

রহমত মিঃ আহাদের হাত থেকে ফল নিয়ে বলে—না মিঃ চৌধুরী, আমি আগে ফল চেয়ে দেখি যদি সুমিষ্ট হয় তাহলে খাবেন।

মিঃ আহাদের মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা স্মৃতি—অজানা দ্বীপের একটি কাহিনী। মিঃ আহাদ হেসে বললেন—বেশ, তাই খেয়ে দেখো তবে আমি বললাম ফল বিস্বাদ হবে না।

সবাই মিলে ওরা ফল খেলো।

অদ্ভুত সুন্দর এবং সুমিষ্ট ফল, পেট পুরে খেলো ওরা।

মিঃ আহাদ বললেন—জায়গাটা যেমন সুন্দর মনোরম তেমনি ফলগুলো সুমিষ্ট সুস্বাদু। খোদা রহমানুর রাহিম আমাদের জীবন রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন, তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু থেমে তিনি বললেন—এই মুহূর্তে একটি কথা আমার মন বড় চঞ্চল করে তুলছে, আমি না বলে পারছি না।

রহমত বললো—বলুন স্যার, আমরা আপনার গল্পটি শুনতে চাই,

গল্প নয় রহমত, সত্য কাহিনী। কাহিনীটা তোমাদের রাণীজীকে নিয়েই......

বলুন মিঃ চৌধুরী, বলুন? বললেন বন্ধু ভদ্রলোকটি।

মিঃ আহাদ একটি ফল হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা সম্মোহিত ভাবের উন্মেষ। তিনি বললেন—আমি এবং রাণী প্লেনে কংগো অভিমুখে যাচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমরা বসে আছি। বাইরে হাল্কা খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। প্লেনখানা একটু উঠানামা করে এগুচ্ছিলো। আমরা নিজ নিজ আসনে বসে তাকিয়েছিলাম বাইরের হাল্কা ভেসে চলা মেঘগুলোর দিকে, কারণ তখন ভারী সুন্দর লাগছিলো মেঘের আনাগোনা। বিস্ময়ভরা চোখে এ সৌন্দর্য উপভোগ করছি ঠিক ঐ সময় প্লেনখানা ভীষণভাবে দুলে উঠলো। প্লেনখানা দুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে নিচে নামতে লাগলো। বুঝতে পারলাম ইঞ্জিনে আগুন ধরে

গেছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর কি হলো বা ঘটলো আমার কিছু মনে নেই।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে বললো রহমত—মিঃ চৌধুরী, তারপর? তারপর আপনারা বেঁচে আছেন কি করে?

সেই কথাই বলছি তোমাদের।

বলুন?

সঙ্গী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন মিঃ আহাদের মুখের দিকে, কারণ কাহিনীটা শুধু বিস্ময়কর নয়, একেবারে অদ্ভুত।

মিঃ আহাদ বলতে শুরু করলেন—যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন দেখলাম সমস্ত শরীর রোদে টন টন করছে। মাথায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করলাম। অনেক কষ্টে উঠে বসে স্মরণ করতে চেষ্টা করছি আমি এখন কোথায়। ধীরে ধীরে মনে পড়লো সব কথা... রাণীর কথা মনে পড়তেই ডুকরে কান্না এলো কিন্তু কেঁদে কি হবে। আমি এখন কোথায়? কিভাবে বেঁচে আছি? প্লেনখানাই বা কোথায়? প্লেনের যাত্রিগণই বা কোথায় কে জানে? অসহ্য মাথাব্যথা, মাথাটা যেন টন টন করছে। মাথায় হাত দিলাম, চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে মাথার মধ্যে, চুলগুলো জমাট বেঁধে আছে। প্রচণ্ড সূর্যের তাপ যেন আগুন ছড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলাম না, উঠে দাঁড়ালাম তারপর চলতে শুরু করলাম।

একটু থামলেন মিঃ আহাদ, ব্যথাভরা হাসি হেসে বললেন—কি হবে পুরোন কথার পুনরাবৃত্তি করে?

মিঃ চৌধুরী, বড় শুনতে ইচ্ছে করছে সেই ইতিহাস, যে ইতিহাস আপনার এবং রাণীজীর জীবনকে সার্থক করে তুলেছিলো সেদিন। বলুন আমরা শুনবো।

ভদ্রলোকটি বললেন মিঃ চৌধুরী, এই মুহূর্তে আমরা পথ চলতে অক্ষম, কাজেই আপনি যদি আপনার...সেই অজানা কাহিনী শোনান তবে সার্থক হবো।

মিঃ আহাদ বললেন, তবে শুনুন আপনারা...ধু ধু বালুরাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। একদিকে বিশাল সমুদ্র অপর পাশে সীমাহীন প্রান্তর। পা উঠতে চায় না, তবু এগুচ্ছি। মাথার উপরে সূর্য ভীষণ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ক্ষুধা-পিপাসায় মরিয়া হয়ে উঠেছি, একবিন্দু শীতল পানির জন্য জীবনটা বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। অথচ সমুদ্রের অজস্র জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়ছে আমার পায়ের কাছে। একবার দু'হাত ভরে তুলে নিলাম। যেমন মুখে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে থু থু করে ফেলে দিলাম, কারণ সমুদ্রের পানি ভীষণ লবণাক্ত তাই জিভটা বিস্বাদ হয়ে উঠলো।

থামলেন মিঃ আহাদ, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলেন—এবার সমুদ্র ছেড়ে এগিয়ে চললাম বালুরাশির বুকের উপর দিয়ে সোজা পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। হঠাৎ বালুর মধ্যে দেখলাম মানুষের পায়ের ছাপ। শুধু ছাপ নয়, জুতোর দাগ। এই অজানা জনমানবহীন স্থানে জুতোর ছাপ এলো কি করে? রাণীর জন্য বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম কাজেই মনে হলো রাণী তো এ পথে যায়নি? কিন্তু রাণী কি করে বাঁচতে পারে, নিশ্চয়ই প্লেন দুর্ঘটনায় সে নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকতে পারে না সে কিছুতেই......হু হু করে কান্না বেরিয়ে এসেছিলো সেদিন রাণীর কথা স্মরণ করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন মিঃ আহাদ, আজও সেই রাণীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, না জানি রাণীকে আর পাবো কিনা......গলাটা ধরে আসে মিঃ আহাদের।

বন্ধু ভদ্রলোক বললেন—মিঃ চৌধুরী, সেই থেকে রাণীকে পাননি বুঝি?

পেয়েছিলাম তবে আবার সে হারিয়ে গেছে। জানি না পাবো কিনা। ...কি বলছিলাম পায়ের ছাপ দেখে একটা ক্ষীণ আশার উদয় হয়েছিলো আমার মনে সেদিন, হয়তো জীবিত আছে সে ......কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখলাম জুতোর ছাপ মিশে গেছে অজস্র এবড়ো থেবড়ো পায়ের ছাপের অন্তরালে, হারিয়ে গেলো আমার সবকিছু। একটু দূরে দেখলাম একটি অগ্নিকুণ্ডের ভস্ম স্তূপ আশে পাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা নরকঙ্কাল।

নরকঙ্কাল!

হাঁ রহমত, ঐ নরকঙ্কাল দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম সেদিন, মনে করেছিলাম রাণীকেই হত্যা করে তার মাংস জংলীরা আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছে। একটা দারুণ উৎকুণ্ঠা নিয়ে চারিদিকে তাকালাম, হঠাৎ নজরে পড়লো দূরে বহু দূরে একটি কালো রেখা। বুঝতে পারলাম ঐ রেখা কোনো গ্রাম বা জঙ্গল হবে। আমি সেই কালো রেখা লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে গেলাম সেই কালো রেখার পাশে। রেখা নয়, বিশাল ভয়ঙ্কর এক গহন বন। একটা কথা কালো রেখা লক্ষ্য করে এগুচ্ছিলাম তখন একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলাম, মৃতদেহটি ছিলো আমরা যে প্লেনে যাচ্ছিলাম সেই বিধ্বস্ত প্লেনখানার চারজন চালকের মধ্যে একজনের। লোকটার মাথা সম্পূর্ণ থেতলে গেছে, মুখ দেখলে বুঝবার উপায় নেই কে সে। মৃতদেহটার পাশেও সেই জুতোর দাগ লক্ষ্য করলাম, একটা আশা আনন্দ আমাকে সজীব করে তুললো—তবে কি কেউ এই অজানা দ্বীপে জীবিত আছে? কিন্তু সেই গহন জঙ্গলের কাছে এসে আমার সব আশা-বাসনা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। তবু মনটাকে শক্ত করে নিয়ে গহন বনে প্রবেশ করলাম। সেকি ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব জন্তুর আনাগোনা। আমি কখনও গাছের ডালে চেপে, কখনও ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে এগুতে লাগলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো—তখন আর এগুতে পারলাম না, একটা বড় গাছ দেখে তাতে চেপে বসলাম।

মিঃ আহাদের কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনছিলো রহমত এবং সঙ্গী ভদ্রলোক। বললো রহমত—বলুন মিঃ চৌধুরী, তারপর?

গভীর রাত, বসে আছি একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের মোটা ডালে। ডালটা একটি হেলান দেওয়ার মত ডাল ছিলো, তাই আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, যদিও মাথাটা টন টন করছে। ক্ষুধায় নাড়িভুড়ি হজম হবার জোগাড়, যেমন একটু আগেও আমাদের পেটের অবস্থা ছিলো। হাঁ, খুব ক্লান্তি বোধ করছিলাম, তাই ঘুম আসছিলো। বৃক্ষের নিচে হিংস্র জীবজন্তুর আনাগোনার শব্দ পাচ্ছি, কারণ তারা হয়তো ঐ বৃক্ষের নিচে মানুষের গন্ধ পাচ্ছিলো। বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি, তিনি ছাড়া মহাবিপদ মুহূর্তে কে

আছেন আর! হয়তো একটু নিদ্রাবোধ করছি, ঠিক ঐ মুহূর্তে ঢাকের আওয়াজ কানে ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদেবী আমার চক্ষু আসন ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হলেন, আমি সজাগ হয়ে বসলাম।

একটু থামলেন মিঃ আহাদ, হয়তো বা তিনি একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি আজ কয়দিন ধরে শুধু উপবাসীই নন, ঠিকমত নিদ্রা বা গোসলও হয়নি! তবু তিনি বলতে লাগলেন—হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে বহু দূরে। দেখলাম অনেকগুলো মশাল উঠছে নামছে ঢাকের তালে তালে। বুঝতে পারলাম জংলীদের কোনো আনন্দ উৎসব হচ্ছে। দাউ দাউ করে আগুনও জ্বলছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দে জংলীদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠলো, আমি ভুলে গেলাম হিংস্র জীবজন্তুর কথা। গাছের উপর থেকে নেমে এলাম নিচে, অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর এগুতে না এগুতেই সহসা কোথা থেকে এসে একদল জংলী মশাল হাতে ঘিরে ফেললো আমাকে।

আমি নিরস্ত্র এবং ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। মাথার ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। পারলাম না জংলীদের বাধা দিতে, জংলীরা আমাকে বেঁধে ফেললো এবং নিয়ে চললো সেই ঢাকের আওয়াজ লক্ষ্য করে।

আমাকে যখন ওরা হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিলো তখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুগুলো ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

কিছুক্ষণ চলার পর দেখলাম একটি বিরাট অগ্নিকান্ড ঘিরে কতকগুলো মশালধারী জংলী ধেই ধেই করে নৃত্য করে চলেছে। ওরা আমাকে নিয়ে হাজির হলো সেই অগ্নিকুন্ডের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা তাদের নৃত্য থামিয়ে ফেললো।

আমি বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখলাম একটি মাচার উপর দাঁড়িয়ে আছে রাণী, আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বললাম—রাণী, তুমি বেঁচে আছো? রাণীও আমাকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, সে আমাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি.....তুমি জীবনে রক্ষা পেয়েছো...রাণী এবং

আমার কথা জংলীরা একবর্ণ বুঝতে পারলো না। রাণী আমার পাশে আশার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমিও ওর পাশে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব কিন্তু কেউ আমরা এগুতে পারছি না, কারণ রাণী ছিলো সুউচ্চ মাচার উপরে আর আমি নিচে ভূতলে, আমার হাত-পা লতা দিয়ে মজবুত করে বাঁধা। আমি বুঝতে পারছি জংলীরা আমাকে হত্যা করে আমার মাংস অগ্নিদগ্ধ করে খাবে। তবু আমার খুব আনন্দ হচ্ছিলো রাণী জীবিত আছে দেখে। সত্য আমার বিশ্বাস ছিলো না আর কোনোদিন রাণীকে দেখতে পাবো।

হয়তো রাণীর মনেও তেমনি একটা বিপুল উন্মাদনা, সেও হয়তো ভেবেছিলো আর কোনো দিন আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে না, অথচ আমাকে সে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছে, এ যেন তার কত আনন্দের কথা কিন্তু সে তার উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করবার সুযোগ পাচ্ছে না। তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত জংলী।

অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম জংলীরা রাণীকে সমুদ্রের দেবী মনে করেছে এবং সে কারণেই তাকে সুউচ্চ মঞ্চে রেখে ওরা পূজা করছে। ইতিমধ্যেই তার সম্মুখে তিনটা নরবলি দেওয়া হয়ে গেছে। মস্তক বিচ্ছিন্ন তিনটি লাশ পড়ে আছে মঞ্চের সম্মুখে। আরও লক্ষ্য করলাম, মঞ্চের উপরে কিছু অগ্নিদগ্ধ নরমাংস একটি পাত্রে সাজানো রয়েছে, হয়তো রাণীকে ঐ নরমাংস খেতে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু রাণী নরমাংস না খাওয়ায় কিছু ফলমূল ও পানীয় হিসেবে কয়েকটা ডাব রাখা হয়েছে। হয়তো রাণী কিছু ফলমূল ও ডাব গ্রহণ করে থাকবে। সে আমাকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিচিলিত হয়েছে বলে মনে হলো, কারণ আমাকেও বলি দেওয়ার জন্য জংলীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাণীর দু'চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠলো, আমি রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—দুঃখ করোনা রাণী, মৃত্যু যখন একদিন হবেই তখন ক'দিন আগেই না হয় মরলাম।

রাণী আমার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বারবার হাতের পিঠে চোখের পানি মুছতে লাগলো।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন দ্রুত কেটে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে একটি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত, তারপর আমার মস্তকবিহীন দেহটাও পড়ে থাকবে ঐ মৃতদেহ তিনটির পাশে। হয়তো আমার দেহটাও ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝলসে নিয়ে ওরা মহা উল্লাসে খাবে এবং খানিকটা রাখবে রাণীর সম্মুখে। ভয় না পেলেও মনটা মুষড়ে পড়লো আমার। বিশেষ করে রাণীর কথা স্মরণ করে—এই গহন বনে জংলী অসভ্যদের মধ্যে রাণী কি করে বেঁচে থাকবে ভেবে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। হয়তো একদিন তার জামা-প্যান্ট ছিড়ে একাকার হয়ে যাবে, চুলগুলো জটা ধরে যাবে, নখগুলো অসম্ভব বড় হবে, তখন সেও ধীরে ধীরে জংলী বনে যাবে তাতে কোনো ভুল নেই। রাণীকে ওরা যখন দেবী বলে গ্রহণ করেছে তখন তাকে হত্যা করবে না।

জংলীরা আমাকে নিয়ে গেলো বলির কাঠগোড়ায়। খর্গ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিকট আকার জংলী।

ওরা যখন আমাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাঠগোড়ায় দাঁড় করালো, ঠিক ঐ সময় রাণী মঞ্চ থেকে থেমে এলো নিচে এবং মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলো।

বিস্ময়কর ঘটনা—চিরদিন আমার মনে থাকবে সেদিনের কথাটা। রাণীকে মানে তাদের দেবীকে প্রণাম করতে দেখে সমস্ত জংলী নারী-পুরুষ রাণীর অনুকরণে মাটিতে মাথা রেখে আমাকে প্রণাম করতে লাগলো। এমনকি খর্গধারী জংলীটিও হাতের খর্গ পাশে রেখে ভূতলে মাথা রেখে প্রণাম জানালো।

রাণী যতক্ষণ ভূতলে মাথা রেখেছিলো, জংলীরা ততক্ষণ মাথা উঁচু করলো না। জংলীদের দলপতি রাণীকে লক্ষ্য করছিলো। রাণী যখন মাথা তুললো তখন দলপতি মাথা তুলে অদ্ভুত এক রকম শব্দ করলো, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা তুলে দাঁড়ালো।

এবার রাণী নিজের হাতে খুলে দিলো আমার দেহের বাঁধন, রাণীকে দলপতি নিজে সাহায্য করে চললো।

জংলীরা বুঝতে পারলো রাণী দেবী আর আমি তাদের দেবতা... ...কথাটা বলে হাসলেন মিঃ আহাদ।

রহমত আর সঙ্গী ভদ্রলোকটি এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলো মিঃ আহাদের কথাগুলো। তারা একই সঙ্গে বলে উঠলো—মিঃ চৌধুরী, তারপর কি ঘটলো?

মিঃ আহাদ বললেন—আজ আর নয়, পরে আবার একদিন বলবো। তবে সেদিন আমাকে হত্যা না করার কারণ রাণীর উপস্থিত বুদ্ধি। তাছাড়া রাণী এবং আমার দেহের বর্ণ সাদা এটাও, তাদের দেবতা হিসেবে নিঃসন্দেহ হওয়ার একমাত্র কারণ।

রহমত এবং জঙ্গী ভদ্রলোকের আরও জানার বাসনা থাকা সত্ত্বেও মিঃ আহাদ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চলতে হবে এবার, রাণীকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত নই...

পিছনে পড়ে রইলো ফলভরা বৃক্ষটি। মিঃ আহাদ কিছু ফল রুমালে বেঁধে নেওয়ার জন্য রহমতকে বলেছিলো, রহমত কিছু ফল একটি রুমালে বেঁধে নিয়েছিলো। পথ চলতে গিয়ে বললো রহমত— মিঃ চৌধুরী, আপনি কিন্তু আসল কাহিনীই বাদ রেখেছেন। কারণ ফল হাতেই আপনি কাহিনী শুরু করেছিলেন কিন্তু ফলের কথা আপনার কাহিনীতে উঠেনি।

হাঁ, আমি যা বলবো বলে কাহিনী শুরু করেছিলাম তা বলা হয়নি। সুযোগ এলেই বলবো, সে কাহিনী আরও বিস্ময়কর।

রহমত এবং সঙ্গী ভদ্রলোক বিপুল আগ্রহ নিয়ে পথ চলতে লাগলো, আবার তারা বিশ্রামকালে মিঃ চৌধুরীর বাকি কাহিনী শুনতে পাবে।

❑

টেলিফোন বেজে উঠলো।

ইন্সপেক্টার মিঃ কোইস্‌গিন রিসিভার তুলে নিলেন হাতে...... হ্যালো, কোইস্‌গিন বলছি........

ওপাশ থেকে ভেসে এলো গম্ভীর ভারী গলার আওয়াজ, ইন্সপেক্টর কোইস্ গিনের বুকটা ধক করে উঠলো। মুখমণ্ডল ঈষৎ ফ্যাকাশে হলো, কারণ কণ্ঠস্বর তাঁর অতি পরিচিত। যে কণ্ঠস্বরের ইংগিতে জম্বুর দুঃস্থ মানুষের মুখের গ্রাস চলে যাচ্ছে জম্বুর বাইরে অন্য দেশে, যে কণ্ঠস্বরের ইংগিতে জম্বুর দুঃস্থ নিরীহ জনগণ আজ জম্বুর জেলে আটক রয়েছে, সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি জনাব কোরেশীর কণ্ঠ এটা। তিনি শুধু স্বনামধন্য ব্যক্তিই নন, তিনি জম্বুর ভাগ্যনিয়ন্ত্রা প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী।

ইন্সপেক্টার মিঃ কোইস্ গিন বললেন—বলুন স্যার, এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই...আর থাকলেই বা কি, আপনার নির্দেশমতই আমরা কাজ করে চলেছি।

......হিপ্পির মাঝিমাল্লাদিগকে আটক করুন, কারণ তাদেরও চক্রান্ত আছে বলে মনে হচ্ছে......

......আচ্ছা স্যার......

......দেখুন জম্বুর বস্তি এলাকা থেকে যে সব দুঃস্থ নামধারী দুস্কৃতিকারীকে আপনারা আটক করেছেন তাদের একজনও যেন ছাড়া না পায়। জম্বু নদীতীরে ওরা যে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করেছে তা যদি ফেরত দেয় তাহলে ছাড়া পেতে পারে।......

......আমরা আপনার নির্দেশমতই সবকিছু করছি......

......আমাদের কিছু মাল নিয়ে একটি জাহাজ আজ জম্বু বন্দর ত্যাগ করবে। জাহাজটির নম্বর ৭৭৭। যেন কোনোরকম অসুবিধায় না পড়ে, এ জন্য প্রতিটি বন্দরের পুলিশমহলকে টেলিফোনে জানিয়ে দিবেন...

......নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো......কিন্তু কি মাল নিয়ে জাহাজ ৭৭৭ জম্বুর বাইরে যাচ্ছে যদি জানাতেন স্যার...

......এত দুঃসাহস হলো কি করে আপনার যে আপনি জাহাজে কি মাল জম্বুর বাইরে যাচ্ছে তা জানতে চান?......

মুহূর্তে ইন্সপেক্টার কোইস্ গিনের মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে পড়লো, তিনি ঢোক গিলে বললেন......ভুল হয়েছে স্যার, ক্ষমা করবেন......

ওপাশ থেকে ভেসে এলো...হাঁ, মনে রাখবেন আপনারা সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী এবং সেইভাবে কাজ করে যাবেন...

...নিশ্চয়ই করবো স্যার...—

...শুনুন, ৭৭৭ জাহাজ জম্বুর বাইরে সীমান্তের ওপারে না পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বভার আপনাকে গ্রহণ করতে হবে......

...স্যার, চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না......

...সে কথা বলেই খালাস পাবেন না ইন্সপেক্টার, জাহাজখানা যাতে জম্বুর জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পৌঁছাতে সক্ষম হয় সেই ব্যবস্থা করবেন......

...আচ্ছা স্যার, করবো...

ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

ইন্সপেক্টার কোইস্ গিন বিবর্ণমুখে রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতে যাবেন, পুনরায় ফোন বেজে উঠলো।

কোইস্‌গিন রিসিভার তুলে নিলেন......হ্যালো, পুলিশ অফিস, কোইস্‌গিন বলছি...কে মিঃ আব্বাস হাজারী...বলুন......

শোনা গেলো আব্বাস হাজারীর কণ্ঠস্বর...ইন্সপেক্টার, আমার দশ ট্রাক মাল জম্বুর সীমান্তে পুলিশের ঈষিজার বাহিনী আটক করেছে। এই মুহূর্তে পুলিশ সুপারকে জানিয়ে ট্রাকগুলো ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করুন...

...আচ্ছা, আমি পুলিশ সুপারের নিকট ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি...

...জানিয়ে দিচ্ছি নয়, এক্ষুণি দিন...

...আচ্ছা স্যার......

...খেয়াল রাখবেন যদি মাল সহ ট্রাকগুলো আজ ছাড়া না পায় তাহলে আমার অনেক লোকসান যাবে, কারণ ট্রাকে কাঁচা মাল রয়েছে...

...ঠিক আজই, আজই যেন ছাড়া পায় তার ব্যবস্থা করছি......

আব্বাস হাজারী ফোন ছেড়ে দিতেই মিঃ কোইস্‌গিন রিসিভার হাতে রেখেই পুলিশ সুপারের অফিসে ফোন করলেন।

জম্মুর পুলিশ সুপার অফিসেই কাজ করছিলেন, টেবিলে ফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠতেই তিনি ফোন ধরলেন......

মিঃ কোইস্‌গিনের গলা শোনা গেলো......স্যার, জনাব আব্বাস হাজারী এইমাত্র জানালেন জম্মু সীমান্তে ঈষিজার পুলিশ বাহিনী তাঁর নিজস্ব কয়েকটি মাল বোঝাই ট্রাক আটক করছে......

......হাঁ, আমি জানতে পেরেছিলাম এবং ঈষিজার পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে বলে দিয়েছি ছেড়ে দিতে......

......স্যার শুনে অনেক খুশি হলাম......

রিসিভার রাখার সাথে সাথে আবার ফোন বেজে উঠলো।

মিঃ কোইস্‌গিন রিসিভার কানে ধরলেন...হ্যালো...পুলিশ অফিস......হাঁ, আমি কোইস্‌গিন বলছি...

...কাল রাতে দুস্কৃতিকারী হিসেবে যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে সে এখন কোথায়?......

......আপনি কোথা থেকে বলছেন এবং কে বলছেন?...টেলিফোনে প্রশ্ন করলেন কোইস্‌গিন।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো...আমি কে এ কথা জানতে চান?

...হাঁ, জানতে চাই...

......জম্মুর প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী জনাব কোরেশীর শ্যালক ফৌজিয়া কোরেশী...

...সালাম স্যার, মাফ করবেন আমি আপনাকে চিনতে পারিনি—বলুন স্যার, কি করতে হবে?

...কেন, যা বললাম তা কি কানে প্রবেশ করেনি, কাল রাতে ডাকাতির অভিযোগে যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে সে এখন কোথায়?...

...স্যার, এক্ষুণি জেনে নিয়ে জানাচ্ছি...

...সে এখন কোথায় জানতে চাই না...তাকে যেন এই মুহূর্তে মুক্তি দেওয়া হয়, কারণ সে হলো আমার স্ত্রীর সহোদর......নচেৎ মনে রাখবেন...

...স্যার, আমি আপনার কথামত্ কাজ করবো......আস্ সালামো আলায়কোম—

কোনো জবাব এলো না, রিসিভার রাখার শব্দ শোনা গেলো মাত্র।

মিঃ কোইস্ গিনের ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা, তিনি এখন কি করবেন! গত রাতে যে দুষ্কৃতিকারী জম্বু ঈষিকা সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছে সে সাধারণ ব্যক্তি নয়, স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারীর শ্যালক ফৌজিয়া কোরেশীর শ্যালক। নাম তার যাই হোক জানার প্রয়োজন মনে করে না। একটি প্রকাশ্য ডাকাতি কেসে ভদ্রলোক ধরা পড়ে গেছে। হয়তো পুলিশ মহল তার আসল পরিচয় জানতে পারেনি, তখন জানলে এমন ভুল তারা কিছুতেই করতে পারতো না। ক্ষুদ্ধ জনতা কয়েকজন দুস্কৃতিকারীর ডাকাতকে পিটিয়ে হত্যা করেছে, ভাগ্যজোরেই হয়তো রক্ষা পেয়ে গেছে শ্যালকের শ্যালক। পুলিশমহল তাকে ক্ষুদ্ধ জনতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জেলে ভরে রেখেছে। কোইস্ গিন যত ভাবছেন ততই তাঁর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে। কি করে তিনি এমন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন, রিসিভার হাতে নিয়ে তিনি চিন্তা করে চলেছেন। একদিকে কর্তব্য পালন অপরদিকে চাকরি রক্ষা, দুটোই তাঁর কাছে সমান কিন্তু কর্তব্য পালন করতে গেলে তাঁকে ন্যায়পথে চলতে হবে। দুস্কৃতিকারী জেনে তাকে মুক্তি দেওয়া আইনত অপরাধ। না না, তিনি জেনেশুনে কোনো অন্যায় করতে পারেন না। পারেন না তিনি আব্বাস হাজারীর দশ ট্রাক কাঁচামাল সীমান্তের ওপারে পার করে দিতে।

...কিন্তু তাঁর পরিণতি হবে কি? চাকরিটা চলে যাবে। সরকার-পক্ষ যদি বিমুখ হয় তাহলে তাঁর ভাগ্যাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে, কাজেই তিনি বিবেকের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারীর শ্যালকের শ্যালককে মুক্তি দেবার জন্য তিনি জম্বু জেলের অফিসারের কাছে ফোন করলেন—আমি কোইস্ গিন বলছি, প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ কোরেশীর নির্দেশ, গতরাতে যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ডাকাতির অভিযোগে ধরা পড়েছে, তাকে এক্ষুণি মুক্তি দিন—

সরকারের নির্দেশ অমান্য করার সাহস জম্বু জেলারের ছিলো না। তিনি আদেশ পাওয়ামাত্র কোরেশীর শ্যালকের শ্যালককে মুক্তি দিলেন বিনা বিচারে, বিনা কৈফিয়তে।

যে মুহূর্তে জেল সুপার কোরেশীর নাম শুনলেন সেই দণ্ডেই তিনি আদেশ পালন করলেন বাধ্যগত দাসের মত। আজ প্রথম বা নতুন নয়, এমনি প্রায়ই ফোন আসে, যখনই কোনো দুষ্কৃতিকারী পাকড়াও হয় তখন কোনো না কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির ভাগ্নে কিংবা সন্তান অথবা সহোদর। তখন মুক্তি না দিয়ে উপায় থাকে না, কারণ সরকারি কর্মচারী হয়ে সরকারের নির্দেশ অমান্য করার সাহস তাঁদের হয় না, তাই তাঁরা নাচের পুতুল বনে আছেন।

এমনি কত দুষ্কৃতিকারী প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে দিনের আলোতে প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ইচ্ছামত যা খুশি তাই করে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলার সাহস পায় না, কারণ তারা সরকারের লোক।

পুলিশমহল এদের দেখেও না দেখার ভান করে, জেনেও না জানার অভিনয় করে। যতদূর সম্ভব সম্মান দেখায়, কারণ তারা তো নাচের পুতুল। যেভাবে সরকার তাদের চালাচ্ছে সেইভাবে চলছে। শুধু জম্বুতেই পুলিশমহল নাচের পুতুল বনে যায়নি, ঝাম শহরেও পুলিশ এমনি এক অবস্থায় রয়েছে। পুলিশমহলের নিজের কোনো ক্ষমতা নেই, দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাদেরকে যেমন ভাবে চালাচ্ছে তেমনিভাবে তারা চলছে।

মিঃ কোইস্গিন জেল সুপারকে ফৌজিয়া কোরেশীর শ্যালকের মুক্তি দান দেবার কথা জানিয়েই জম্বুর ঈষিজা পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে জানালেন, যে দশটি কাঁচামাল বোঝাই ট্রাক যা ঈষিজা পুলিশবাহিনী আটক করেছে তা যেন অচিরে ছেড়ে দেওয়া হয়, কারণ সেগুলো আব্বাস হাজারীর মাল।

কথাটা শুনেই ঈষিজা পুলিশ বাহিনীর প্রধান মাথা নত করে নিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন না এ মাল কার। তখনই পুলিশ প্রধান মালবোঝাই ট্রাকগুলো ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

শুধু দুরালাপনীর মাধ্যমে চলেছে দেশরক্ষার অজুহাতে দেশ ও দশের সর্বনাশের কাজ।

ঈষিজা পুলিশ প্রধান তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করে জানিয়ে দিলেন আটক ট্রাকগুলো যেন অচিরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

থানা অফিসার পুলিশ প্রধানের হুকুম পেয়ে কোনো রকম টু বাক্য করলেন না, তিনি ওসিকে হুকুম দিলেন ট্রাকগুলো ছেড়ে দিতে।

আব্বাস হাজারী তাঁর প্রাসাদে বসে শুনলেন ট্রাকগুলো মুক্তি পেয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। আব্বাস হাজারীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো। আব্বাস হাজারী এবার রিসিভার তুলে নিয়ে জম্বুর পুলিশ অফিসে ফোন করলেন...হিপ্পির মাঝিমাল্লাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছি কি?...

ফোন ধরেছিলেন পুলিশ অফিসার ইনচার্জ মিঃ কাওসারী। তিনি জানালেন, এখনও তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি, তবে এক্ষুণি এ ব্যাপারে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কতকটা আশ্বস্ত হলেন মিঃ আব্বাস হাজারী। তিনি রিসিভার রেখে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালেন।

এমন সময় কক্ষের মোটা মূল্যবান পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রখ্যাত ব্যক্তি নুরানী ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক হাবিবুল্লা।

আব্বাস হাজারী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—বসুন হাবিবুল্লাহ্ সাহেব।

হাবিবুল্লা আসন গ্রহণ করলেন।

আব্বাস হাজারী সিগারেটের বাক্সটা বের করে দিয়ে বললেন—নিন, পান করুন।

হাবিবুল্লা একটি সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর বললেন—হঠাৎ কি সংবাদ হাজারী সাহেব, কেন ডেকেছেন আপনি?

আব্বাস হাজারী একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন— এবার আপনার কারখানায় যে মাল উৎপাদন হবে তার তিন ভাগ আমাদের দিতে হবে।

হাবিবুল্লা সাহেব বললেন—প্রতিবারই তো মাল আপনাদেরকে দিচ্ছি হাজারী সাহেব, এবারও না হয় নেবেন তা এত বলতে হবে কেন?

দেখুন, আজকাল দেশের জনগণ বড় বিগড়ে উঠেছে, অতি সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে। ব্যবসা করে দুটো পয়সা আমরা রোজগার করছি, এটা যেন তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাছাড়া কোন্ এক শয়তান বেটা কোথা থেকে এসে অকস্মাৎ আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত করলো। হিপ্পির তিন কোটি টাকা পণ্যদ্রব্য লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিলো সে দেশের যারা অপদার্থ সেমই দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে।

হাবিবুল্লা বললেন—কে সে ব্যক্তি যাকে পুলিশ বাহিনী এত প্রচেষ্টা চালিয়েও খুঁজে বের করতে পারলো না? লোকটা যেন যাদুকর, কাজ হাসিল করে সরে পড়েছে।

আব্বাস হাজারী রাগে ফেটে পড়ে বললেন—লোকটা এক নম্বর দুস্কৃতিকারী।

হাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কথাটা বলতে বলতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন পুলিশ সুপার মিঃ লোদী।

মিঃ আব্বাস হাজারী এবং হাবিবুল্লা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

মিঃ লোদী আসন গ্রহণ করে বললেন—লোকটা সম্বন্ধে সবার মনেই কৌতূহল। এখন কোন্ ব্যক্তি আছে যে পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে জম্বুর বুকে কাজ করে যাচ্ছে? তবে আমাদের সুদক্ষ পুলিশ বাহিনীর চোখে বেশিদিন ফাঁকি দেবে এমন সাধ্য তার নেই।

মিঃ আব্বাস হাজারী বললেন—মিঃ লোদী, লোকটাকে আপনি স্বচক্ষে দেখেননি, দেখলে বুঝতেন এমন পুরুষ কোনো দিন দেখেছেন কিনা। অদ্ভুত-সুন্দর-সুপুরুষ বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি কঠিন তার কণ্ঠ-স্বর, তেমনি ভয়ঙ্কর সে...একটু থেমে বললেন হাজারী—আমাকে দয়া দেখিয়ে নাকি মুক্তি দিয়েছে, আর যেন কুকর্ম না করি। কুকর্ম... লোকটা পাগল আর কি,

শয়তানও বলা চলে। আমরা ব্যবসা করে দু'পয়সা রোজগার করছি এতে তার মাথাব্যথা কেন?

মিঃ লোদী বললেন—হাঁ, অন্যায় বটে। আপনাদের টাকা দিয়ে আপনারা ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন এতে তার এত মাথাব্যথা কেন, সত্যিই বিস্ময়কর বটে!

কিন্তু মনে রাখবেন লোদী সাহেব, সেই শয়তান ডাকু কিছুতেই আমাদের ব্যবসা বন্ধ করতে পারবে না। হিপ্পির পণ্যদ্রব্য সে লুটে নিয়ে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। আরও কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য আমাদের ৭৭৭ জাহাজে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও ট্রাকবোঝাই কাঁচামাল আমরা গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সাধ্য নেই কারও আমাদের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করে।

ঠিক বলেছেন মিঃ আব্বাস, ব্যবসা তো ব্যবসাই। আচ্ছা, এবার কত মণ চাল মজুত রেখেছেন? কথাটা বললেন লোদী সাহেব।

মিঃ আব্বাস হাজারী তাঁর সিগারেটে শেষবার মত টান দিয়ে বললেন—বেশি নয়, মাত্র বিশ হাজার মণ চাল মজুত রেখেছি। ইচ্ছা ছিলো পঞ্চাশ হাজার মণ মজুত রাখবো।

হাবিবুল্লা সাহেব বললেন—এখন চালের দর দু'শত টাকা মণ, মানে একসের পাঁচ টাকা। আপনার কি মনে হয় আরও বাড়বে?

এবার আব্বাস হাজারী দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন—খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দু' শত টাকা বেশি চালের দর উঠবে না, মানে উঠতে দেবেন না। কিন্তু এতে শুধু তাঁর নয়, দেশের অনেক মহান ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হবে। তাঁদের গুদামে মজুত আছে হাজার হাজার মণ চাল। কাজেই চালের দর যত বাড়বে তত মুনাফা। দু'শত টাকা মণ হয়েছে, পাঁচশত টাকা যদি চালের মণ হয় তবু আমাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই।

মারহাবা আব্বাসী সাহেব, মারহাবা! কথাটা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন সবাই।

প্রত্যেকে করমর্দন করলেন মন্ত্রী মহোদয়ের। তিনি আসন গ্রহণ করার পর অন্যান্য সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

অসময়ে মন্ত্রী মহোদয়কে দেখে কেউ চমকে উঠলেন না বা বিস্মিত হলেন না, কারণ তিনি মাঝে মাঝেই জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে জনাব আক্কাস হাজারীর বাসভবনে আরও কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতেন।

আজও তিনি এসেছেন, এতে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। মন্ত্রী মহোদয় আসন গ্রহণ করার পর আলোচনা শুরু হলো। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো দেশে খাদ্যসঙ্কট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ মনোভাব যাতে না জাগতে পারে, এ নিয়েই গবেষণা।

মন্ত্রী সাহেব বললেন—জনাব আক্কাস হাজারী যা বললেন ঠিক কথা। দেশে দু'শত টাকা মণ চালের দর হয়েছে তাতে আমাদের কি!

যারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে মিছিল করে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতিতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গলা দিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছে, যারা বিক্ষোভ করছে, মরবে তারাই......

হাঁ স্যার, সত্যি কথা বলছেন, জনগণই মরবে। আর মরা দরকারও, কারণ দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে দেশে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখনই মিছিল, সভা-সমিতি, বিক্ষোভ, তাহলে চিন্তা করুন জনসংখ্যা বাড়লে আমাদের গুদামে আর কিছু মজবুত থাকতে দেবে না।

আক্কাস হাজারীর কথায় বলে উঠলেন মন্ত্রী মহোদয়—গুদাম লুট তো হবেই, লুট করে নেবে আপনার আমার টেবিলের খাবার, বুঝলেন?

তাহলে কি উপায় স্যার? বললেন আক্কাস হাজারী।

মন্ত্রী মহোদয় তাকালেন মিঃ লোদীর দিকে, তারপর বললেন—পুলিশ মহলকে আরও সজাগ হতে হবে।

স্যার কোন্ ব্যাপারে? বললেন মিঃ লোদী।

মন্ত্রী মহোদয় পুনরায় একটি সিগারেটে নতুনভাবে অগ্নিসংযোগ করে বললেন—জনগণ যাতে বিক্ষোভ মিছিল না করতে পারে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেদিকে কড়া হুশিয়ারি রাখতে হবে। জনগণের কণ্ঠ রোধ করতে পারলেই আমাদের মুনাফার ব্যাঘাত ঘটবে না।

মিঃ লোদী আসন ত্যাগ করে সম্মানের সঙ্গে বললেন—স্যার, পুলিশ মহল সদা সজাগ রয়েছে যাতে দেখে খাদ্যসমস্যা নিয়ে কোনোরকম হৈ চৈ না হয় বা না হতে পারে। স্যার, দেখছেন না দু'শত টাকা চালের মণ তবু জনগণ কেমন গুরগুর করে দেশের কাজকর্ম করে যাচ্ছে।

হাঁ, তাতো দেখতেই পাচ্ছি লোদী সাহেব। চালের দর গগনচুম্বী, দ্রব্যমূল্য অগ্নিসম তবু তো মানুষ তেমনি সোজা হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তেমনি অফিস আদালত করছে, তেমনি কলকারখানায় কাজকর্ম করছে, তেমনি সবকিছুই হচ্ছে, কোথাও তো নেতিয়ে পড়ার লক্ষণ দেখি না। বরং সিনেমা-বাইস্কোপে, মেলা-পার্বনে, মার্কেটে ভিড় জমে উঠেছে। দেখলে মনে হয় দেশের আজ পরম সুদিন। আব্বাস হাজারী সাহেব, আপনি বলছেন না খেয়ে মানুষ মরে কিন্তু কই, তার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন হাবিবুল্লা সাহেব, তিনি বললেন—স্যার, আপনারা যা দেখছেন এটাই দেশের জনগণের আসল রূপ নয়। আসল রূপ লুকানো আছে গ্রামেগঞ্জে, শহরের নিকৃষ্ট বস্তি অঞ্চলে, যা সহসা আপনার বা আমার চোখে পড়ে না।

সে কি রকম? মন্ত্রী মহোদয় ভ্রুকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন।

হাবিবুল্লা জবাব দিলেন—যারা আজ খাদ্যাভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তারা হলো শ্রমিক মজুর, সামান্য ফেরিওয়ালা, ছোটখাট দোকানদার এবং গ্রামাঞ্চলের চাষীর দল। এ ছাড়াও সামান্য মাইনের যারা চাকরি করে তারা। স্যার, এসব লোক কোনোদিন আপনার বা আমার প্রাসাদের লৌহফটক পেরুতে সাহস পায় না, কাজেই নজরেও পড়ে না। ওরা যত

চেঁচামেচিই করুক ফটকের বাইরে থেকেই করবে, ভিতরে প্রবেশের ক্ষমতা নেই!

আব্বাস হাজারী বললেন—হাঁ স্যার, হাবিবুল্লা সাহেব ঠিক কথা বলেছেন। ঐ নগণ্য মানুষগুলো ছাড়া কেউ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে চেঁচামেচি করে না। যত বিক্ষোভ করছে ওরাই, কাজেই ওদের কণ্ঠ রোধ করতে হবে।

সোফায় হেলান দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন মন্ত্রী সাহেব—কণ্ঠ এবার আপনাআপনি রোধ হবে। পূর্বের সজীব রক্ত যে ক'দিন শরীরে আছে চেঁচাবে, তারপর ধীরে ধীরে শরীর যখন রক্তশূন্য হয়ে আসবে, তখন আপনাআপনি কণ্ঠ রোধ হয়ে আসবে। চাবিকাঠি আমার হাতের মুঠায়, হেঁ হেঁ হেঁ......হাসলেন মন্ত্রী প্রবর।

মিঃ আব্বাস হাজারী বললেন—স্যার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন চালের দর দু'শত টাকার বেশি বাড়তে দেবেন না? তা পাঁচশত হলে কি আমাদের মুনাফা বেশি পড়ছে?

তেমনি শান্ত স্থির কণ্ঠে জবাব দিলেন মন্ত্রী সাহেব—মুখের কথাই কি আমার মনের কথা? আপনারা নিশ্চিত থাকুন আপনাদের মজুত মালে লোকসান হবে না। আমি সীমান্তের ওপারে যে এজেন্ট রেখেছি সে আমাদের পণ্যদ্রব্য উচিত মূল্যে টেনে নেবে। লোদী সাহেব, আপনি পুলিশমহলকে এ ব্যাপারে সজাগ হবার নির্দেশ দেবেন।

লোদী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানের সঙ্গে জনগণ যেন দেশের এই মহা ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেদিকে সূতীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

নিশ্চয়ই রাখবো স্যার।

শুধু জম্বুর নয়, ঝাম এবং অন্যান্য দেশেও আজ এই খাদ্য সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করেছে।

হাঁ স্যার, কিন্তু......

বলুন কিন্তু কি?

জম্বুর মত কোনো দেশে খাদ্যাভাব এমন প্রকট নেই। জম্বুর মধ্যবিত্ত সমাজ আজ একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাই স্যার......

বলুন কি বলতে চান?

বলছি দেশের এই অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন আনা যায় না?

মিঃ লোদী, আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন?

বলছি জম্বুর অবস্থা যত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে ততই বাইরের রাষ্ট্রগুলো আমাদের দেশের এই অবনতি এবং অক্ষমতার জন্য উপহাস করছে, তাই বলছিলাম যদি আপনারা কিছু.........

বলুন থামলেন কেন?

মানে দেশের দুঃস্থ জনগণের প্রতি যদি নজর দেন তাহলে..

গর্জে উঠলেন মন্ত্রী মহোদয়—আপনার স্পর্ধা তো কম নয়! নজর না দিলে এতদিন দেশ টিকে আছে কি করে? সব সময় আমাদের খেয়াল আছে। দেশের অবস্থা নিয়ে সব সময় মাথা ঘামাচ্ছি আমরা। দেখুন যা বললাম স্মরণ রেখে কাজ করবেন...মন্ত্রী সাহেব তাঁর কথা শেষ না করেই মিঃ আব্বাস হাজারীকে বললেন—জাহাজ ৭৭৭ কি সীমান্তের ওপারে পৌছে গেছে?

হাঁ স্যার, জাহাজ ৭৭৭ ঠিকমতই পৌছে গেছে ওপারে। আমাদের লোক পৌছেই সংবাদ পাঠিয়েছে।

যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কথাটা বলে মন্ত্রী মহোদয় সিগারেটের নিঃশেষিত টুকরাখানা গুঁজে রাখলেন এ্যাসট্রের মধ্যে।

হাবিবুল্লা বললেন—স্যার, আপনি অতি বুদ্ধিমানের মত কাজ করে-ছিলেন তাই জাহাজ ৭৭৭ অতি সহজে লোকচক্ষু এড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পৌছে গেছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠে। আব্বাস হাজারী রিসিভার তুলে নিয়েই কানে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন তিনি—কি দুঃসংবাদ..ট্রাকগুলো সব আটক করে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে বা কারা এ কাজ করেছে কেউ বলতে পারে না?...

ওপাশ থেকে শোনা কথাগুলোই এক নিশ্বাসে বলে যান আক্কাস হাজারী সাহেব। কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন মন্ত্রী মহোদয়—কি বললেন, আমাদের মালবোঝাই ট্রাকগুলো সব......

হাঁ স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমাদের সবগুলো ট্রাক আটক করে কোনো দুষ্কৃতিকারী সব লুটে নিয়ে দুঃস্থ জনসগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। সর্বনাশ হয়েছে স্যার, সর্বনাশ হয়েছে। রিসিভার রেখে দিয়ে ললাটে করাঘাত করতে থাকেন আক্কাস হাজারী।

ফোন বেজে উঠে আবার।

রিসিভার তুলে ধরেন এবার হাবিবুল্লা সাহেব...হ্যালো...

ওপাশ থেকে শোনা যায়...একদল জমকালো পোশাক পরা লোক অকস্মাৎ ট্রাকগুলোর উপর হামলা চালায়...তারা ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ড্রাইভারদের পুতুল বানিয়ে তাদের কাজ হাসিল করে চলে যায়...

হাবিবুল্লা সাহেব ললেন—তখন ট্রাকগুলো কোন্ এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলো...

ওপাশ থেকে শোনা গেলো...জম্বু ত্যাগ করে ফিরোজা ও হিম্সার সীমান্তে গাড়িগুলো পৌছার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতিকারী হামলা চালায়...হিম্সার পুলিশ বাহিনী কিছু করতে পারেনি। বললেন হাবিবুল্লা।

শোনা গেলো...দুষ্কৃতিকারীরা তাদের কাজ সমাধা করে চলে যাবার পর পুলিশ বাহিনী ফোর্স নিয়ে এসেছিলো কিন্তু তখন তারা সচ্ছন্দে চলে গেছে...

...আপনি কোথা থেকে বলছেন এবং কে বলছেন? জিজ্ঞাসা করলেন হাবিবুল্লা সাহেব।

শোনা গেলো সেই কণ্ঠস্বর...আমি সেই জমকালো মূর্তি যাকে এত ভয়...

হাবিবুল্লা সাহেবের হাত থেকে রিসিভার খসে পড়লো, ভাগ্যিস মেঝেতে না পড়ে তাঁর কোলে পড়লো।

মন্ত্রী মহোদয়, আব্বাস হাজারী ও মিঃ লোদী বিস্ময় নিয়ে বললেন—কি হলো? কি হলো?

হাবিবুল্লা ফ্যাকাশে মুখে ঢোক গিলে বললেন—যে জমকালো মূর্তি হাজারী সাহেবকে বন্দী করে হিপ্পির সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিলিয়ে দিয়েছিলো সেই ব্যক্তি এই মুহূর্তে ফোন করেছিলো......

বলেন কি হাবিবুল্লা সাহেব? এক সঙ্গে বলে উঠলেন মন্ত্রী মহোদয় এবং মিঃ লোদী। আব্বাস সাহেব তো আরষ্ট হয়ে গেছেন। তাঁর মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করেছে। এবার বজ্রাঘাত হলো কক্ষমধ্যে সবার মাথায়।

বললেন মন্ত্রী মহোদয়—সেই জমকালো পোশাকপরা লোকটা নিজে ফোন করে জানিয়ে দিলো, বলেন কি?

হাঁ স্যার, আশ্চর্য যে নিজে সব লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে অথচ সেই নিজে ফোন করে জানালো। এটা শুধু বিস্ময়কর নয়, একেবারে অবিশ্বাস্য।

মন্ত্রী মহোদয় ফিরে তাকালেন লোদী সাহেবের দিকে—মিঃ লোদী, পুলিশমহল কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়? কেন দেশে এমন অরাজকতা শুরু হলো, এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতেই হবে আপনাকে। আপনি জম্বু পুলিশ সুপারকে জানিয়ে দিন, পুলিশ বাহিনী যদি ঠিকমত কাজ না করতে পারে তাহলে তাদের সবাইকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।

মিঃ লোদী উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মধ্যে হাত চলে বললেন—স্যার, পুলিশমহল সদা সজাগ রয়েছে তবু এমন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে...

আপনারা অপদার্থ হয়ে পড়েছেন, দেশরক্ষার সামর্থ্য আপনারা দিন দিন হারিয়ে ফেলছেন। যান পুলিশবাহিনীকে জানিয়ে দিন দুস্কৃতিকারীরা যেন আর দেশের শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে।

মন্ত্রী মহোদয় রিসিভার হাতে নিয়ে তাঁর অন্যান্য পার্টনার স্বনামধন্য মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দিলেন।

মিঃ আব্বাস হাজারী বললেন—স্যার, আপনি কিছু ভাববেন না। এবার দেশে সরকারি খাদ্য সংগ্রহ অভিযান চালানোর নাম করে যে খাদ্যশস্য আমরা আমাদানী করেছি এবং যা গুদামে বোঝাই করে রেখেছি তার তিন

ভাগ যদি আমরা সরাতে পারি তাহলে দশ ট্রাক কাঁচামালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবো।

পারবো নয়, পারতে হবে আব্বাস সাহেব। নাহলে এই এক মাসে কোটি কোটি টাকা লোকসান আমাদের মেরুদন্ড ভেংগে দেবে। কথাগুলো ক্লান্তভাবে বললেন মন্ত্রী মহোদয়।

মিঃ আব্বাসী সাহেব বললেন আবার—নূরানীনূর ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকে এ মাসে যে শিশুখাদ্য আমদানী হবে তার তিন ভাগ হাবিবুল্লা সাহেব আমাদের হাতে দেবেন। এ মাল যদি আমরা দেশের বাইরে পাঠাতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের মুনাফা দাঁড়াবে আড়াই কোটি টাকা। স্যার, সেই শয়তান দুস্কৃতিকারী আমাদের যতই ক্ষতি করতে চেষ্টা করুক না কেন, সে কিছুই করতে পারবে না, কারণ আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা কেউ বানচাল করতে পারবে না। স্যার, একটা কথা বলবো?

বলুন?

দেশের জনগণ যাতে বুঝতে না পারে যে আপনারা আমাদের সঙ্গে জড়িত আছেন মানে সরকারের কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি আমাদের ব্যবসার সঙ্গে...

বুঝতে পেরেছি আব্বাসী সাহেব, আপনি যা বলতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছি। হাঁ, মনে রাখবেন এমন সুকৌশলে কাজ করবো, একটি প্রাণীও জানতে বা বুঝতে পারবে না।

স্যার, দেশে খাদ্যসমস্যা নিয়ে ভীষণ একটা তোলপাড় শুরু হয়েছে, এ সময় সজাগ থেকে মান-সম্মান রক্ষা করবেন।

সে ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। আমি জনগণকে কিভাবে শান্ত রাখতে হয় জানি। আমাদের জম্বু সরকারের গুদামে বহু খাদ্যশস্য মজুদ আছে বলে জানিয়েছি, তবু তো তারা কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।

বলে উঠেন লোদী সাহেব—জনগণকে কতদিন এমন করে থামিয়ে রাখা যাবে স্যার? মুখের সান্ত্বনা বাক্যে এক মাস দু'মাস তিন মাস, তার বেশি

তো শান্ত রাখা সম্ভব নয়। পেটের আগুন বড় আগুন, সে আগুন জ্বললে জনগণকে থামানো যাবে না স্যার। তারা তখন বোমার চেয়ে ভয়ঙ্কর হবে।

আপনাদের মনের দুর্বলতাই দেশকে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মিঃ লোদী। দেশ কিভাবে শাসন করতে হয় তাও আপনাদের জানা নেই।

স্যার, আপনারা যেভাবে আমাদের চালাচ্ছেন সেইভাবে আমরা চলছি। নতমস্তকে কথাটা বললেন মিঃ লোদী সাহেব।

সেদিন আর বেশি আলাপ হয় না, কারণ জম্বুর নায়না মাঠে একটি বড় জনসভা আছে, সভায় উপস্থিত থাকবেন জম্বুর খাদ্যমন্ত্রী এবং আরও কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁবা দেশের অবস্থা নিয়ে বক্তৃতা করবেন।

আসন ত্যাগ করার মুহূর্তে মন্ত্রী তাঁদের ট্রাকবোঝাই কাঁচামাল লুট সম্বন্ধে আর একবার দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং মিঃ লোদীকে পুলিশবাহিনী সম্বন্ধে আরও সজাগ হবার নির্দেশ দিলেন।

❑

বনহুর ফিরে এসে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলো তার আসনে। সমস্ত দেহে তার জমকালো পোশাক। পায়ে ভারী বুট। মাথার পাগড়ীটা খুলে ফেলে দিয়েছে পাশের বিছানায়। চোখেমুখে তাঁর দীপ্ত উজ্জ্বল ভাব ছড়িয়ে আছে। নিজ হাতে সে বিলিয়ে এসেছে প্রায় বিশ লাখ টাকার কাঁচামাল ফিরোজা এবং হিম্সা সীমান্তের অগণিত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে।

বনহুরকে সাহায্য করেছে তাঁর জম্বু অনুচরগণ। হিম্সার পুলিশ বাহিনী সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছবার পূর্বেই তাদের কাজ শেষ হয়েছিলো।

আস্তানায় অন্যান্য অনুচর নিজ নিজ পোশাক পরিবর্তন করছিলো। তারা সবাই বনহুরের সঙ্গে গিয়েছিলো সীমান্তে। রহমান ও রামসিং এখনও ফিরে আসেনি, তারা গেছে জাহাজ ৭৭৭-এর সন্ধানে। সীমান্তের ওপারে

জাহাজখানা পার হয়ে গেলেও বনহুরের অসাধ্য কিছু নয়। কৌশলে সে জাহাজখানাকে হটিয়ে আনবে এবং জাহাজের সমস্ত মাল দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবে।

বনহুর প্রতীক্ষা করছে রহমান ও রামসিংয়ের জন্য। তারা এলেই কি তার করণীয় ভেবে নেবে সে। বনহুর কুহেলি পর্বত থেকে ফিরে এসে প্রথমেই জম্বুর দুঃস্থ আটক ব্যক্তিদের মুক্ত করবে ভেবেছিলো কিন্তু তা হয়নি, কারণ সে আস্তানায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পেয়েছিলো দশ ট্রাক কাঁচামাল খাদ্যশস্য সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর সহ অশ্বযোগে গমন করেছিলো ফিরোজা অভিমুখে। সেখানে পৌঁছতে বেশি বিলম্ব হয়নি, কারণ বনহুর উল্কাবেগে দলবল নিয়ে ট্রাকগুলো পথরোধ করে আটক করেছিলো। ততক্ষণে তার অন্যান্য অনুচর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে দুঃস্থ জনগণকে ডেকে এনে জড়ো করেছিলো সেখানে। অবশ্য প্রথমে জনগণ আসতে চায়নি, ভয় পেয়েছিলো, কারণ যারা তাদের আহ্বান জানাচ্ছে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু এসেছিলো ওরা, কারণ তারা ছিলো দীর্ঘদিনের অনাহার জর্জরিত দুঃস্থ মানুষ।

যখন তারা হাত পেতে নিয়েছিলো সেই খাদ্যসম্ভারগুলো তখন তাদের আনন্দ ধরেনি। জীর্ণশীর্ণ ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষগুলোর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো আনন্দাশ্রু। ওরা প্রাণভরে আশীর্বাদ দিয়েছিলো ঐ অজানা বন্ধুদের। কারণ কতদিন হলো তারা পেট পুরে খেতে পায়নি। শুধু শাক, কচু, ঘেচুসেদ্ধ খেয়ে তারা জীবনে বেঁচে আছে। কারও পরনে কাপড় নেই, সবাই প্রায় অর্ধ উলঙ্গ। যে বস্ত্রখানা তাদের লজ্জা নিবারণে সহায়তা করছে তাও বুঝি কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি। সাবান বা সোডা দূরে কথা, হয়তো বা পরিষ্কার পানিও জোটে না তাদের ভাগ্যে।

গ্রামবাসীরা প্রচুর খাদ্যশস্য পেয়ে ফিরে গেলো সবাই যে যার বাড়িতে, খুশি তাদের ধরছে না। কতদিন তাদের উনুনে আগুন জ্বলেনি, আজ তাদের উনুনে আগুন জ্বলবে।

চাষী খাদ্যদ্রব্যগুলো নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলো—ওগো, এই নাও, ঘর থেকে হাড়িপাতিল বের করো। উনুনে আগুন জ্বালো। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের ডেকে তোলো...কতদিন পর বাছারা আমার পেট পুরে দুটো ভাত খেতে পারবে...

স্ত্রী একখন্ড ছেঁড়া বসন দিয়ে শরীর ঢাকার বৃথা চেষ্টা করছে তবু তার মুখে হাসি ফুটেছে—ওতে কি এনেছো, চাল? চাল এনেছো তুমি!

হাঁ গো হাঁ, ভাত হবে। কতদিন পর ঘরে আজ ভাত রান্না হবে। ছেলেমেয়েদের ডেকে তোলো, ওদের জাগিয়ে তোলো। সোনারা আমার আজ একমুঠো ভাত ভাবে...যাও, দেরী করোনা তুমি, আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

স্ত্রীর মুখের ব্যথাকাতর ক্ষুধাতুর ভাব মুছে গিয়ে হাসি ফোটে। ভাষা তার হারিয়ে গেছে, হাড়ি পরিষ্কার করতে করতে বলে—চেঁচিয়ে বলো না, ও বাড়ির ওরা জেগে উঠলে এসে কেড়ে নেবে গো তোমার চালের পুঁটলি।

হেসে বলে স্বামী—ভয় নেই, আজ সবার ঘরে চাল। জানো বৌ, এ পাড়ার এমন কেউ নেই যার ঘরে চাল নেই......

ওগো, তুমি কি পাগল হয়েছো, সবার ঘরে চাল এলো কি করে?

শুধু চাল নয়—ডাল, আলু, শুকনো মরিচ সব পেয়েছি, ক'দিন আমাদের ভাবতে হবে না।

হাঁড়িতে চাল দিয়ে কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললো স্ত্রী—এত কে দিলো গো? রিলিফ বুঝি? একি বিদেশ থেকে সব সাহায্য এসেছিলো?

জানি না, কিছু জানি না আমরা। কারা তারা, তাদের আমরা কেউ চিনি না, এমনকি ওদের দেখিনি কোনোদিন। আমাদের গ্রামের সবাইকে দিয়েছে ওরা, ক'দিন আমরা পেট পুরে খেতে পারবো।

স্ত্রী উনানে হাঁড়ি চাপিয়ে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে—ক'দিন পর জমিতে ফসল পাকবে তখন আর চিন্তা থাকবে না।

ভাত হয়, ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে খেতে বসে ওরা। থালায় ভাত দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সে কি আনন্দ, ওরা হাতমুখ ধোয়া ভুলে গিয়ে গোগ্রাসে খেতে থাকে।

স্ত্রী এবং স্বামীও সন্তানদের সঙ্গে বসে যায়। একসঙ্গে এতগুলো থালা হয় না বলে রান্নাঘরের পিছন থেকে ওরা কলাপাতা কেটে আনে।

স্বামী যখন কলাপাতা কাটছিলো তখন ও বাড়ির চাষীও কলাপাতা কাটছিলো, বললো—কি ভাই, পাতা কি করবে?

এ বাড়ির চাষী বলে—তুমি পাতা কি করবে?

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে জেগে উঠেছে তাই......

আমারও তাই......

হাসি যেন আজ ধরে না ওদের মুখে।

সবাই বসে পেট পুরে খায়, খুশিতে ডাগর ডাগর হয়ে উঠে বাচ্চাদের চোখগুলো।

কতদিন এমনি করে পেটপুরে খায়নি। দেহগুলো যেন চামড়া ঢাকা জীবন্ত কঙ্কাল। চাষীর অবস্থাও তাই, জমি চাষ করবে কি করে, পেটে ভাত নেই। হালের গরু নেই; যা গরু ছিলো বিক্রি করে দু'শত টাকা মণ চাল কিনে খেয়েছে। চালের সঙ্গে তেল বা তরিতরকারির বালাই নেই, সেদ্ধ-পোড়া করে কোনোরকমে জীবন রক্ষা করেছে? এখন গরু নেই, ঘরে কোনো জিনিসপত্র নেই, জমিতে ফসল নেই, দেশে দারুণ খাদ্যসঙ্কট—এমন অবস্থায় জীবন বাঁচে কি করে। তবু বাঁচতে হবে, বাঁচার ইচ্ছা কার না আছে। তাই জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু কতদিন এমনি অনাহারে কাটিয়ে জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে? কুখাদ্য, কচুসেদ্ধ, কলাগাছ সেদ্ধ খেয়ে কতদিন খাড়া হয়ে থাকতে পারে মানুষ? দেশে সেই আগের মতই ফসল ফলছে। চারিদিকে শস্যশ্যামলা ধরণী যেন হাসছে। মাঠে মাঠে পাকা ধানের গন্ধ, অথচ ফসল মাঠ থেকে কেটে আনার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ যাদুকরের যাদুকাঠির স্পর্শে সব অকস্মাৎ হাওয়ায় উবে যায়।

চাষীদের ঘরে ঘরে কান্নার ঢেউ উঠে। আবার শুরু হয় কুখাদ্য অখাদ্য খাওয়া। শুরু হয় চুরি-চামারি—না খেতে পেয়ে পেটের জ্বালায় এর গোয়াল থেকে ছাগল, ওর কলাগাছ থেকে কলার কাঁদি, না হয় পাকা কাঁঠাল। যদি খোদা তার নসিব ভাল করে তবে গৃহস্থের হাত থেকে রক্ষা পায়, ঐ পয়সায় চলে একটা দিন কিংবা দুটো দিন। আর যদি ধরা পড়ে যায় ভাগ্যগুণে তাহলে তো রক্ষা নেই, পেট পুরে দু'মুঠো খাবার পরিবর্তে পায় উত্তম মধ্যম, তারপর মাথা নেড়ে বলে মুখে চুনকালি মাখানোর পালা, তারপর হাজত বাস।

এমন কেউ থাকে না যে তার ঘরের সন্ধান নিয়ে দেখবে বেচারী কেন এ কুকর্ম করতে এসেছিলো। সবাই তখন মহৎ ব্যক্তি, যে যা মুখে আসে গালমন্দ করছে। অথচ যারা গালমন্দ করছে তারাই এক একজন বড় চোর মানে চোরাকারবারী বা চোরাচালানী। কাজেই চুনোপুঁটি যারা তারাই পেটের দায়ে চোর বনে জেল খেটে মরে আর রুই-কাৎলা সত্যিকারের ডাকাত, যারা, তারা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে স্বর্ণপাত্রে পানীয় পান করে।

খেতে খেতে চাষীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি।

ছেলেমেয়েরা তখন আনন্দ করে খাচ্ছে।

হঠাৎ ছোট ছেলেটার চোখ গিয়ে পড়ে পিতার মুখের উপর। খাবার খেয়ে হাসবে তা নয়, বাপ তার কাঁদছে। বলে উঠে ছোট ছেলেটা—বাপু তুমি কাঁদছো?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে চাষী—কই না তো!

ততক্ষণে স্ত্রীও দেখে ফেলেছে।

এতক্ষণ ওরা সবাই পেটে জ্বালায় গোগ্রাসে উদর পূরণ করে চলেছিলো, এবার বলে উঠে—ওগো, তুমি খাবার সামনে কাঁদছো?

চাষী স্ত্রীর কথায় আরও ডুকরে কেঁদে উঠে, তারপর চোখ মুছে বলে জানো কেন কাঁদছি? তোমরা কেউ জানো না। কাঁদছি একমুঠো খাবার পেয়ে আজ আমার বাচ্চারা কত খুশি হয়েছে, আর দেশে এমন অনেক

লোক আছে যাদের বাচ্চারা এসব মুখেও করে না। তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার এর চেয়েও অনেক ভাল, অনেক পুষ্টিকর...তাই ভাবছি বাছারা আমার কত খুশি হয়েছে একমুঠো অন্ন পেয়ে। একটু থেমে বললো চাষী—যে অন্ন পেয়েছি তাও সেই সব মহৎ ব্যক্তির দয়ায়, তারা না দিলে তিল তিল করে শুকিয়ে মরতে হতো।

❑

ফিরোজা সীমান্ত এলাকায় যখন দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে খুশির উৎসব বয়ে চলেছে তখন বনহুর প্রস্তুত হচ্ছে বাইরে বের হবার জন্য।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। সমস্ত জম্বু শহর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। রাজপথ জনশূন্য, দু'একটা যানবাহন এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে।

আক্কাস হাজারীর বাসভবনে আজ একটি গোপন বৈঠক বসেছে। শহরের কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তি ছাড়াও আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত আছেন।

আলোচনা হচ্ছিলো কিভাবে দেশের দুঃস্থ জনগণকে শান্ত রাখা যায়। শুধু আলোচনার বিষয়বস্তু দুঃস্থ জনগণই ছিলো না, তাঁদের ব্যবসা নিয়েও আলোচনা হচ্ছিলো।

অত্যন্ত গোপনীয় আলোচনা।

ঐ সময় টেবিলে ফোন বেজে উঠলো।

একসঙ্গে চমকে উঠলেন কক্ষমধ্যের সবাই। গভীর রাতে আক্কাস হাজারীর বাসায় কে ফোন করেছে! তাঁদের এ গোপন বৈঠকের কথা কেউ জানে না, এমন কি আক্কাস হাজারীর বাড়ির চাকরবাকরও নয়।

সবাই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলেন।

রিসিভার হাতে তুলে নিলেন আক্কাস হাজারী ....হ্যালো স্পিকিং আক্কাস হাজারী......

গম্ভীর ভারী কণ্ঠস্বর......হাজারী সাহেব, মুক্তি পেয়েছিলেন কোন্ শর্তে মনে আছে......

...এ্যাঁ...কে...কে আপনি......

... আমি আপনার বন্ধু......যে বন্ধু সেদিন আপনাকে হত্যা না করে মুক্তি দিয়েছিলো......মনে আছে না ভুলে গেছেন আমার কথা....

এ্যাঁ এ্যাঁ...তুমি...তুমি...আপনি...আব্বাস হাজারীর মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, তাঁকে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে শুধু এ্যাঁ এ্যাঁ করতে দেখে কক্ষমধ্যের সবাই হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান, এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। কেউ তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সত সাহস পান না।

আব্বাস হাজারী ফ্যাকাশে মুখে বলে উঠেন...আছে...আপনার সব কথা মনে আছে...আমি...আপনার নির্দেশ মেনে চলছি...কোনো ..কোনোই...কুকর্ম করছি না...

...কোনোই কুকর্ম করছেন না তাহলে?...

...তবে দশ ট্রাক কাঁচামাল কার ছিলো যা গত পরশু ফিরোজা ও হিম্‌সা সীমান্ত এলাকা পার হয়ে ওপারে চলে যাচ্ছিলো?... বলুন......বলুন ও ট্রাকগুলো কার ছিলো?

খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় আজও উপস্থিত ছিলেন, তিনি আব্বাস হাজারীর কানের কাছে কান পেতে শুনছিলেন। কে বলছে এবং কি বলছে, সব কথাই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। রিসিভারের মুখে হাত রেখে বললেন খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়—বলুন ঐ দশ ট্রাক মাল কার ছিলো আমি জানি না।

মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় বলেন আব্বাস হাজারী সাহেব—স্যার, গলা আমার শুকিয়ে গেছে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না।

বলুন, না বললে কি বলবে? বলুন ঐ দশ ট্রাক মাল সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

আব্বাস হাজারী মন্ত্রী মহোদয়ের কথাগুলো যেন বলে চললেন... ঐ দশ ট্রাক মাল সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না...ও মাল কার বলতেও পারি না...

সত্য...হাঃ হাঃ হাঃ...চমৎকার বুলি আওড়াচ্ছেন হাজারী সাহেব...চমৎকার বুলি আওড়াচ্ছেন......জাহাজ ৭৭৭-এর কি কি মাল সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছেন এবং তাতে কোন্ কোন্ মহাত্মার শেয়ার আছে তাও আমি জানি...কাজেই কোনো কথা আমার কাছে গোপন করবেন না হাজারী সাহেব...আমি অচিরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এবং আপনার সঙ্গে যে সব স্বনামধন্য ব্যক্তি পার্টনার হিসেবে আছেন তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাবো...ধন্যবাদ...

আব্বাস হাজারীর হাত থেকে রিসিভার টেনে নিয়ে বললেন মন্ত্রী মহোদয়—কে সেই ব্যক্তি যার এতবড় সাহস গভীর রাতে আপনাকে বিরক্ত করে? যতসব ছোটলোক দুস্কৃতিকারীর দল!

আব্বাস হাজারীর মুখে তখনও রক্ত ফিরে আসেনি, তিনি যেন হাবাগোবা বনে গেছেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের মুখের দিকে। একটু পূর্বেই যাঁর গলা দিয়ে তেজোদ্দীপ্ত আওয়াজ বের হচ্ছিলো এখন তিনি যেন সম্পূর্ণ বোবা বনে গেছেন। হঠাৎ যেন দূর থেকে আব্বাস হাজারী আজরাইলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় তিনি কোনোই জবাব দিলেন না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এতক্ষণ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ সবাই একটা উদ্বিগ্নতা নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলেন, এবার তাঁরা সবাই মুখর হয়ে উঠলেন। এক একজন এক এক রকম প্রশ্ন করে চললেন। প্রথম প্রশ্ন হলো কে, এতরাতে টেলিফোন করেছিলো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলো এবং কি জানালো সে? তৃতীয় প্রশ্ন হলো, মিঃ আব্বাস হাজারী হঠাৎ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন কেন?

যদিও স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বুঝতে পেরেছিলেন আব্বাস হাজারীর নিকটে এমন কোনো ব্যক্তি টেলিফোন করেছে যাকে তিনি যমদূতের মত ভয় করেন।

নেতৃবর্গও যে বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু তাঁদের সাহস আছে, কারণ তাঁরাই তো দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। দেশ যখন মহাসঙ্কটের সম্মুখীন তখন দেশগড়ার নাম করে বড় বড় বুলি আওড়িয়ে সাধুতার মুখোশ করে এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই দেশের জনগণের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। দেশের মানুষ যাতে এ নিগূঢ় রহস্য ভেদ করতে না পারে সেজন্য মহান নেতাগন বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার চালিয়ে চলেছেন।

মিঃ হাজারী বললেন—বুঝতে পারছি না সেই শয়তানটা কেমন করে এতসব খোঁজ পায়।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন—বলেছিতো ঐ বেটা নিশ্চয়ই কোনো যাদুকর, নাহলে আক্কাস হাজারী সাহেবকে সে যা যা বললো সব কথাই একেবারে সত্য। আক্কাস হাজারী সাহেবের সঙ্গে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ব্যবসায় জড়িত আছেন তাও বললো লোকটা।

স্বনামধন্য ব্যক্তিদের একজন বললেন—আপনি দেখছি সবকিছু শুনেছেন?

হাঁ, লোকটা যখন টেলিফোনে আক্কাস হাজারী সাহেবকে বলছিলো তখন আমি সব শুনতে পেয়েছি। আশ্চর্য সে ব্যক্তি, অদ্ভুত তার বলার ক্ষমতা। লোকটা যে শয়তানের নায়ক তাতে কোনো ভুল নেই।

স্বনামধন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন—স্যার, কি বললো সে ফোনে?

আক্কাস হাজারী সাহেব, আপনিই বলুন না ফোনে শয়তান বদমাইশটা কি বললো?

আক্কাস হাজারী তখনও ফোনের কথাগুলোর ভাবমর্ম থেকে সচ্ছভাবে মুক্তি পাননি, কেমন যেন হতভম্বের মত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একটু ভয়াতুর ভাবের রেশ ছড়িয়ে আছে তাঁর চোখেমুখে। তবু যতদূর সম্ভব তিনি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। বললেন আক্কাস হাজারী—সেই লোকটা যে হিপ্পির সমস্ত পণ্যদ্রব্য দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলো ফোন করেছিলো সে, বললো আমাদের ৭৭৭-এ কি কি জিনিস

আমরা সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছি এবং কত টাকার মাল তাতে রয়েছে, সব সে জানে......

স্বনামধন্য ব্যক্তিদের একজন বলে উঠেন—বলেন কি হাজারী সাহেব...সে তাহলে সব জানে?

হাঁ, তাছাড়া আরও বললো—কোন্ কোন্ মহাত্মন আমাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন তাও সে জানে এবং বললো অচিরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে...শুধু আমার সঙ্গে নয় স্যার, আপনাদের সঙ্গেও...

ক্রুর হাসি হেসে উঠলেন মন্ত্রী মহোদয়—আমাদের সঙ্গে বেটা সাক্ষাৎ করার সাহস পাবে! শয়তানটা এতবড় দুঃসাহস পোষণ করে তার মনে? আমরা হলেম দেশের সরকার আর সে একজন চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ।

স্যার, আপনারাইতো সরকার। যা বলেন তাই করেন। দেখলেন না আপনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন চাল পাঁচশত টাকার বেশি বাড়তে দেবেন না, অথচ কেমন সা সা করে পাঁচশত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু আপনার সুকৌশল বুদ্ধি দ্বারা আমরা সবাই আজ দু'চার টাকার মুখ দেখছি। এটা যেন সহ্য হচ্ছে না শয়তানটার। স্যার, আমাদের এত গোপনতা, এত সতর্কতা সত্ত্বেও কি করে সে সব জানতে পারলো বুঝতে পারছি না। স্যার, আরও গোপনতার দরকার আছে বলে আমি মনে করছি।

হাঁ, ঠিক বলেছেন আক্কাসী সাহেব, গোপনতার দিকে আমাদের আরও সজাগ হতে হবে, বিশেষ করে জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করতে হবে। কথাগুলো বললেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি।

অপর একজন বললেন—জনগণ জানলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ ওরা আমাদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন—শুধু ঐ শয়তান বেটাটা আমাদের পিছু লেগে যা ক্ষতি সাধন করলো। কিন্তু পুলিশমহলকে আমি শাসিয়ে দিয়েছি, দেশের অরাজকতা দূর করতে হবে, দুষ্কৃতিকারীরা যাতে কোনোরকম দুস্কর্ম করার সুযোগ না পায় সেজন্য যেন পুলিশমহল সদাসর্বদা সজাগ থাকে।

আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজকর্ম চলছে। যতদূর সম্ভব পুলিশ বাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে দেশে কোনো দুষ্কৃতিকারী কুকর্ম করতে না পারে। কথাগুলো বলে থামলেন স্বনামধন্য ব্যক্তিটি।

প্রথম স্বনামধন্য ব্যক্তি বললেন আবার—পুলিশ মহলকে আরও সজাগ হতে হবে, কারণ পুলিশদের চোখে ধূলো দিয়ে দুষ্কৃতিকারী আমাদের চরম ক্ষতিসাধন করে চলেছে। হিপ্পির প্রায় তিন কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য শয়তানটা লুটে নিয়ে দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিলো। পুনরায় সে ফিরোজা এবং হিম্‌সা সীমান্ত এলাকায় আমাদের দশ ট্রাক কাঁচামাল লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে সে ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে।

তবু সে ক্ষান্ত হয়নি, আমাদের পিছু লেগেই আছে জোঁকের মত। আক্কাস হাজারী সাহেবকে কেমন শাসিয়ে কথা বললো যেন সেই বদমাইশ বেটা দেশের একজন মহান ব্যক্তি। দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো বললেন খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি—রাত চারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। পাঁচটা বাজবার পূর্বেই আমরা নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাবো। কিন্তু সাবধান, কোনো প্রাণী যাতে জানতে না পারে আমরা গভীর রাতে হাজারী সাহেবের বাসভবনে মিলিত হয়েছিলাম।

হাজারী সাহেব বললেন—আমার কেমন যেন ভয় হয়, ঐ শয়তান জমকালো পোশাকধারী লোকটা কখন আচম্‌কা এসে হাজির হবে।

ও আপনার মনের দুর্বলতা মাত্র। যতই সে বলুক, কোনো ক্ষতিই আর সে করতে পারবে না, কারণ জম্বুর সমস্ত পুলিশ বাহিনী আমাদের কথায় উঠছে, বসছে। যা যখন আমরা হুকুম করছি তাই তারা নাচের পুতুলের মত পালন করে যাচ্ছে। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে উঠে দাঁড়ালেন মহামান্য মন্ত্রী মহোদয়।

অন্যান্য নেতৃস্থানীয় যারা আক্কাস হাজারীর সঙ্গে ব্যবসায় সংযোগ রয়েছেন তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। এবার বিদায় গ্রহণ করলেন সবাই।

রাতের অন্ধকারে হাজারী সাহেব বাড়ির ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেলো কয়েকটি গাড়ি।

হাজারী সাহেব নিজ কক্ষের দিকে পা বাড়ালেন। মাথায় তাঁর একরাশ চিন্তা কিলবিল করছে। আজকের বৈঠকটাই পণ্ড করে দিয়েছে এ শয়তান বেটা। অসময়ে টেলিফোনে সব যেন কেমন এলোমেলো করে দিয়েছে সে। ব্যবসা নিয়ে তেমন কোনো আলাপই করা হলো না। আগামী সপ্তাহে নূরানী নূর ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে প্রায় দু'কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকার মাল সরিয়ে নিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠাতে হবে। মালগুলো শিশুখাদ্য, এ মাল ওপারে পাঠানোর পর তাঁরা আবার মিলিত হবে কিন্তু এসব ব্যাপারে আজ কোনো কথাই হলো না। বৈঠক যেন অপূর্ণ রয়ে গেলো। যাক্, টেলিফোনে সব আলাপ-আলোচনা করা যাবে... নিজ মনে কিছুটা সান্ত্বনা নিয়ে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন হাজারী সাহেব।

মিসেস হাজারী অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় প্রহর গুণছিলেন, স্বামীর আগমনে সজাগ হয়ে উঠে বসলেন—কি হলো, বৈঠক শেষ হলো তোমার?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাবার সাহস ছিলো না হাজারী সাহেবের, তিনি একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললেন—তুমি এতক্ষণ ঘুমাওনি?

রুক্ষ কণ্ঠে বললেন মিসেস হাজারী—ঘুমাবো মানে?

মানে ঘুমাবে।

আর তুমি সারা রাত ধরে বৈঠকখানায় বসে ফিস্ ফাস্ করবে। রাতের বেল্যায় বাড়িতে মিটিং আমি পছন্দ করি না।

কেন, কেন পছন্দ করোনা? গলার সুর যতদূর সম্ভব নরম করে বললেন. হাজারী সাহেব।

কোথাকার কোন্ ছোটলোকদের নিয়ে সব সময় তোমার উঠাবসা আমার ভাল লাগে না।

ছোটলোক—কারা ছোটলোক?

যারা রাতের বেলায় তোমার সঙ্গে মিটিং করতে আসে।

তাঁরা ছোটলোক বলো কি বেগম! তাঁরা কারা জানো? স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন হাজারী সাহেব।

কারা জানি।

না, তুমি জানো না, জানলে ছোটলোক বলতে না। জানো বেগম, আজ তোমার স্বামী শুধু হাজারী নয়, কোটি কোটি টাকার মালিক এবং সে কারণেই আজ তাঁরা আসেন আমার দুয়ারে আমার সঙ্গে ব্যবসা করতে। এনারা ছোটলোক বা অল্প পয়সার মালিক নন, এঁরা দেশের নেতৃস্থানীয় স্বনামধ্য ব্যক্তি। যাদের বাড়িতে এঁরা পা দেন তাদের বাড়ির মাটি ধন্য হয়ে যায়, বুঝলে বেগম। আর তুমি কিনা বলছো আমি ছোটলোকদের সঙ্গে উঠা বসা করি। জানো বেগম, আজ আমার কত নাম, দেশের যেখানে যে মাল যেভাবেই আমি পাঠাচ্ছি, শুধু বলবে হাজারীর মাল, তাহলেই খালাস, কেউ কোনো কথা বলবে না। হাজারীর নাম নিয়ে আজ দেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিই ব্যবসা চালাস্থেন এবং বিদেশী ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা তাঁরা জমা করছেন......

এতক্ষণে মিসেস হাজারী যেন অনেকটা নরম হয়ে এসেছেন। যেমন অগ্নিদগ্ধ লৌহে ঠান্ডা পানি পড়লে আস্তে আস্তে তা ঠান্ডায় পরিণত হয় ঠিক তেমনি।

মিসেস হাজারী বললেন—কারা তারা যারা হাজারী কোম্পানীর সঙ্গে কারবার চালিয়ে নিজেদের ধন্য করেছেন?

তাঁদের নাম অতি সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন......

তবে তাঁরা কারা?

বললাম তো স্বনামধন্য ব্যক্তি।

কিন্তু তাদের তো নাম আছে?

আছে, কিন্তু নাম মুখে আনা অপরাধ।

তাহলে তুমি তাদের সঙ্গে ব্যবসা করো কি করে?

নাম ধরতে বাধা আছে বলে ব্যবসা করতেও বাধা আছে নাকি? বেগম, তুমি তাদের নাম জানতে চেও না, কারণ তাঁরা স্বনামধন্য ব্যক্তি।

বলোনা একটু শুনতে ইচ্ছা করছে?

দেয়ালেরও কান আছে, কাজেই আমি বলতে পারবো না। যদি কোনোক্রমে জনগণ তাদের নাম জানতে পারে তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু তুমি কি মনে করো জনগণ তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানেনা? তারা কি সবাই নির্বোধ?

জানে, কিন্তু জেনেও তারা কিছু করতে পারবে না, কারণ তারাও প্রকাশ্যে কারও নাম উচ্চারণ করার সাহস পাবে না।

কেন সাহস পাবে না?

দেশের যাঁরা স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁদের নাম মুখে নেবার সাহস জনগণের নেই, কারণ কার কাঁধে দু'টো মাথা আছে যে তাঁদের নাম মুখে আনবে, কাজেই সবাই নির্বাক ঐখানে, বুঝলে?

গালে হাত রেখে বলেন মিসেস হাজারী—এত জেনেও দেশের মানুষ তো বেশ শান্ত আছে? তোমরা মানে হাজারী টিম দেশের জনগণের মুখের খাবার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো তাবুও তারা নীরব, আশ্চর্য বটে!

বেগম, তুমি আশ্চর্য হচ্ছো কিন্তু দেশের মানুষ মানে জনগণ আশ্চর্য নয়, কারণ তারা জানে, এ ব্যাপারে চোঁচামেচি করলে বিপদ আছে। হয় জেল-ফাঁসি, নয় সরকার বাহিনীর গুণ্ডাদের হাতে অপমৃত্যু। কাজেই এত জেনেশুনেই তারা নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে......

কিন্তু কতদিন জম্বুর মানুষ এমন নিশ্চুপ থেকে তোমাদের অন্যায় অনাচার সহ্য করবে? তোমরা মানে হাজারী টিম যতই সাবধানে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করোনা কেন, একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত হবেই; কারণ অন্যায় করে কেউ কোনোদিন টিকে থাকতে পারে না। একদিন দু'দিন, এক মাস দু'মাস,

এক বছর দু'বছর, না হয় পাঁচ বছর তারা তোমাদের এই দুর্নীতি সহ্য করবে কিন্তু...

না, কোনো কিন্তু নেই বেগম, আমরাই তো সব, যা করবো তাই হবে। যেভাবে দেশের জনগণকে উঠতে বসতে বলবো সেইভাবে তারা উঠবে বসবে হাই তোলেন আব্বাস হাজারী সাহেব।

মিসেস হাজারী বলেন—কিন্তু মনে রেখো, বেশিদিন তোমাদের এই অন্যায় অনাচার দুর্নীতি জনগণ সহ্য করবে না, সেদিন ঘনিয়ে আসছে...

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন আব্বাস হাজারী—বেগম, তুমিও দেখছি জনগণের পক্ষ অবলম্বন করছো? জানো তোমার কণ্ঠও স্তব্ধ করে দিতে পারি।

হয়তো আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারো কিন্তু কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ তোমরা স্তব্ধ করে দিতে পারবে না। সেদিন তোমাদের এ অন্যায় অনাচার দুর্নীতির বিচার করবে জনগণ। বিচারের দিন কেউ তোমাদের ক্ষমা করবে না।

এতবড় স্পর্ধা তোমার এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলে? দেখো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যেন কোনোদিন এমন কথা মুখে এনো না, এবারের মত ক্ষমা করলাম।

❑

রিসিভার রেখে ফিরে দাঁড়ালো বনহুর।

কুর্ণিশ জানালো রহমান আর রামসিং।

বললো রহমান—সর্দার, জাহাজ ৭৭৭ সীমান্তের ওপারে পৌঁছে গেছে। এখন হিম্‌সা বন্দরের অনতিদূরে একটি ছোটখাট বন্দরে জাহাজখানা নোঙ্গর করেছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁ, আমি সেই রকমই অনুমান করে-ছিলাম।

রামসিং বললো—সর্দার, জাহাজ ৭৭৭ যখন জম্বু সীমান্তের এপারে ছিলো তখন যদি জানা যেতো তাহলে আমরা কিছুতেই ৭৭৭ কে ওপারে যেতে দিতাম না, ওপারে পৌঁছার পূর্বেই আমরা সব ব্যবস্থা করতাম।

বনহুর বললো—রামসিং, মিছামিছি চিন্তা করছো। ৭৭৭ গেছে তাতে কি হয়েছে।

ঐ জাহাজে কয়েক কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য জম্বু থেকে পাচার করেছে হাজারী টিম। সর্দার, এই পণ্যদ্রব্য দেশ থেকে পাচার হওয়ায় দেশের যা ক্ষতি সাধন হলো তা অপূরণীয়...

জানি রামসিং, শুধু জাহাজ ৭৭৭ই হাজারী টিমের মাল বহন করে সীমান্তের ওপারে চলে যায়নি, জম্বুর সমস্ত রস শুষে নিয়ে আরও বহু নৌকা জাহাজ ট্রাক, এমন কি আজকাল প্লেনেও সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। একটু থেমে বললো বনহুর—জনগণের চোখে ধুলো দিলেও ওরা আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না। তবে আমি এদের বিচার করতে চাই না, বিচার করবে দেশের জনগণ।

সর্দার, যারা কিছু দেখেও দেখতে পাচ্ছে না, যারা কিছু জেনেও জানতে পারছে না, বুঝেও যারা কথা বলতে পারছে না, তারা কি করে বিচার করবে সেইসব মহান অধিপতিদের?

ধৈর্যের বাঁধ যেদিন ভেঙ্গে যাবে সেদিন জনগণের অন্ধত্ব আপনা আপনি ঘুচে যাবে—ঘুচে যাবে বধিরতা, তখন দেখবে জনগণ কেমন করে বিচার করে বিচারপতিদের। রহমান, রামসিং, তোমরা প্রস্তুত থেকো, আমি আজ রাতে জম্বুর জেল থেকে বস্তির দুঃস্থ জনগণ যাদের পুলিশ বাহিনী আটক করে রেখেছে তাদের মুক্ত করে আনবো। এ ছাড়া আরও একটি কাজ আছে, নূরানী নূর ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকে এ সপ্তাহে যে শিশুখাদ্য উৎপাদন হতো তার তিন

ভাগ হাজারী টিম গোপনে সরানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। আমি হাজারী টিমের এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে চাই।

রামসিং ও রহমান বললো—আমরা প্রস্তুত আছি স্যার।

রহমান, আমি এদের ক্ষমা করবো না। যারা দেশের বুকে বসে দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করে নিজেদের মুনাফা বাড়াচ্ছে, গড়ে তুলছে ঐশ্বর্যের ইমারত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোতে কোটি কোটি টাকা জমাচ্ছে...বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ সে আপন মনে পায়চারী করে চলে।

গুহার দেয়ালে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে কক্ষটা বনহুরের ভারী বুটের আওয়াজ পাথুরিয়া দেয়ালে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছিলো।

রহমান ও রামসিং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের দৃষ্টি মাঝে মাঝে সর্দারের পায়ের বুটে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসছিলো নিজেদের পায়ে। তারা প্রতীক্ষা করছিলো কি বলবে সর্দার এরপর।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করছিলো।

দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, কতকটা যেন অকস্মাৎ বলে সে—সব আমি বরদাস্ত করতে পারি কিন্তু বরদাস্ত করতে পারি না মানুষের মুখের আহার নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে। আমি এদের কাজ লক্ষ্য করে যাচ্ছি, যখন সময় আসবে আমি এদের চামড়া ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে জীবন্ত অবস্থায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবো। খুনের চেয়ে বড় পাপ জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে মুনাফা করা। আমি মুনাফাকারীদের কিছুতেই ক্ষমা করবো না, জনগণ আমাকে সহায়তা করবে......

পুনরায় বনহুর পায়চারী করতে লাগলো। কিছুক্ষণ আপন মনে পায়চারী করার পর বললো সে—জানো রহমান, এইসব মুনাফাকারী কোটি কোটি টাকা মজুত রেখেছে? জানো না। আর জানবেই বা কেমন করে, তারা সুকৌশলে জম্বুর মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করে

চলেছে, এমনকি অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি বিদেশে ইমারত গড়ে রেখেছে। এদেশে কোনো অসুবিধা দেখলেই তারা জনগণের চোখে ধূলো দিয়ে অকস্মাৎ অন্তর্ধান হয়ে যাবে, তখন জনগণ তাদের কোনো হদিসই খুঁজে পাবে না। এই মহামান্য মহান ব্যক্তিগণ শুধু স্বার্থান্ধই নয়, দেশ এবং জনগণের চরম শত্রু। এদের টুঁটি একদিন জনগণ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সর্দার, আপনি একটু পূর্বে বললেন এইসব স্বনামধন্য ব্যক্তি দেশে কোনো অসুবিধা দেখলেই জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে অন্তর্ধান হবে, তাদের কোনো হদিসই খুঁজে পাওয়া যাবে না, অথচ জনগণ কি করে তাদের টুটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করবে সর্দার? কথাগুলো বললো রামসিং।

বনহুরের মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠলো, বললো — সে কথা মিথ্যে নয় রামসিং, তারা সুযোগ বুঝেই সরে পড়বে; তখন জনগণ তাদের নাগাল পাবে না, এটাও সত্য কিন্তু একদিন তাদেরকে দেশের মাটিতে ফিরে আসতেই হবে, কারণ জন্মভূমির মায়া বড় মায়া। যেদিনই ফিরে আসুক না কেন, জনগণের দৃষ্টি সেদিন তারা এড়াতে পারবে না। জনগণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেদিন তারা করবে। জনগণকে যারা তিল তিল করে মারছে তোমরা ভাবতে পারো জনগণ তাদের ক্ষমা করবে? না কিছুতেই না, এসব স্বার্থান্ধ ব্যক্তিকে কেউ ক্ষমা করবে না! পৃথিবীর মানুষ তো করতেই পারে না, তাছাড়া মৃত্যুর পর যদি পরকাল বলে কিছু থাকে সেকালেও তারা রেহাই পাবে না, কারণ পৃথিবীতে যেমন তারা মুনাফা লুটেছে তেমনি পরকালেও তারা যন্ত্রণার মুনাফা লুটবে।

বনহুর এবার আসন গ্রহণ করলো।

রহমান এবং রামসিং তেমনি দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে, বলে সে এবার— রহমান, তোমরা এখন যাও। প্রস্তুত থেকো, আজই আমি জম্বু জেল থেকে

বস্তির সেই অসহায় জনগণ যাদেরকে পুলিশ বাহিনী হাজারী টিমের চক্রান্তে বন্দী করে রেখেছে তাদের আমি খালাস করবো।

কুর্ণিশ জানিয়ে চলে যায় রহমান ও রামসিং।

❑

গভীর রাত।

জেলের সম্মুখে এসে থামলো একটি জীপগাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন স্বয়ং জেলপ্রধান, তাঁর পাশে একজন সুন্দর সুপুরুষ পুলিশ অফিসার। ড্রাইভ করছিলো একজন পুলিশ এবং জীপের পিছনে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ গার্ড।

জেলপ্রধান সুবোধ বালকের মত এগিয়ে চলেছেন জেল ফটকের দিকে।

পাশে এগুচ্ছেন তাঁর সহকারী পুলিশ অফিসারটি। জেল প্রধানের ঠিক পিছনে এবং একটু পাশেই রয়েছেন তিনি!

আগ্নেয় অস্ত্রধারী পুলিশদ্বয় ঠিক তাদের পিছনে দেহরক্ষী হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফটকের মুখে পৌছতেই পুলিশ প্রহরী সেলুট করে সরে দাঁড়ালো। যদিও তারা এত রাতে জেল প্রধানকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলো তবু কোনো টু' শব্দ কেউ করলো না, খুলে দিলো জেলের লৌহফটক।

জেল প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁরা জেলকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

যে জেলকক্ষে জম্বুর দুঃস্থ জনগণকে আটক করে রাখা হয়েছিলো সেই কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ালেন জেল প্রধান এবং তাঁর সঙ্গীরা। জেল প্রধানের নির্দেশমত প্রহরী দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো।

জেল প্রধান বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হলো বলে জানালেন।

বন্দীরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তারা জেগে উঠলো এবং মুক্তির আনন্দে সবাই আত্মহারা হয়ে বেরিয়ে এলো জেল ফটকের বাইরে।

জেল প্রধানও তাঁর সঙ্গীসহ পুলিশ দেহরক্ষীদ্বয় জীপগাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়িখানা নিমিষে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো।

জনহীন পথ বেয়ে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। জেল প্রধানের মুখে কোনো কথা নেই। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপ করে বসে আছেন।

পাশে পুলিশ অফিসার রয়েছেন, তিনি পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—নিন, পান করুন।

জেল প্রধান শুষ্ক কণ্ঠে বললেন—আমি সিগারেট পান করি না।

হেসে বললেন পুলিশ অফিসার—চমৎকার, আপনি এ যুগের মানুষ হয়ে এই মহা ওষুধ পান থেকে বিরত আছেন জেনে খুশি হলাম।

এক সময় জেল প্রধানের বাসভবনের সম্মুখে এসে গাড়ি থামলো।

নেমে দাঁড়ালো দেহরক্ষীদ্বয়।

জেল প্রধানের পাশ থেকে নামলেন পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক তিনি নিজ হাতে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললেন—আসুন।

জেলপ্রধান গাড়ি থেকে যন্ত্রচালিতের মত নেমে দাঁড়ালেন।

তাঁর সঙ্গী অফিসার চাপা কণ্ঠে বললেন—অসংখ্যা ধন্যবাদ। এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসি গুড্ নাইট......

গাড়িতে উঠে বসলেন পুলিশ অফিসারটি। সঙ্গে সঙ্গে দেহরক্ষীদ্বয় উঠে বসলো পিছন আসনে। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

জেলপ্রধান দ্রুত প্রবেশ করলেন তাঁর বাসভবনে। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নিয়ে পুলিশ অফিসে ফোন কররেন।

তখন পুলিশ অফিস ইনচার্জ যিনি ছিলেন তিনি ফোন ধরলেন..... হ্যালো......জম্বু পুলিশ অফিস......আমি কিথাগো বার্ড বলছি......

......জেল প্রধান কথা বলছি, এইমাত্র কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী আমাকে আমার বাসভবনে পৌঁছে দিয়ে গেলো...তারা আমাকে বিছানা থেকে জাগিয়ে জম্বু জেলে নিয়ে যায় এবং জেলের সমস্ত দুঃস্থ বন্দীকে মুক্ত করিয়ে নেয়......আমাকে ওরা আগেই অস্ত্রের মুখে বাধ্য করিয়ে কাজ সমাধা করে এবং পুনরায় রেখে যায় আমার বাসভবনে......

জেল প্রধান এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যান। তিনি রীতিমত হাঁপাচ্ছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার ছাপ ছিলো।

অফিস ইনচার্জ কিথাগো বার্ড শুনে স্তম্ভিত হলেন, তিনি বললেন......স্যার, বড় বিস্ময়কর ব্যাপার...কারা তারা, যারা রাতের অন্ধকারে বিছানা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনাকে নিয়ে গিয়ে জেল থেকে বন্দীদের মুক্তি দেয়......দুঃসাহসী ব্যক্তি তারা তাতে কোনো সন্দেহ নেই......

হাঁ, দুঃসাহসী বটে......আপনি এক্ষুণি পুলিশ সুপারকে সব কথা জানিয়ে দিন......

......আচ্ছা স্যার, এক্ষুণি জানাচ্ছি......

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুলিশমহলে এ ব্যাপার নিয়ে মহা হৈ চৈ এবং তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। পুলিশ সুপার নিজে অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণকে জানিয়ে দিলেন ঘটনাটা। পুলিশ ভ্যানের ছুটাছুটি শুরু হলো।

কিন্তু কোথায় সেই জীপগাড়িখানা। পুলিশমহল অনেক সন্ধান করেও আর সেই গাড়ির হদিস পেলো না।

❑

পরদিন জম্বু পত্রিকায় এ ব্যাপার নিয়ে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশ পেলো ঘটনাটা। জনগণ শুধু বিস্মিতই হলো না, তারা একেবারে হতবাক

হয়ে পড়লো, কে সেই ব্যক্তি যে জেল প্রধানকে রাতের অন্ধকারে তাঁর সুখময় শয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে দুঃস্থ জনগণদের। মনের গহনে সবাই অফুরন্ত আনন্দ বোধ করছে কিন্তু কেউ সে খুশির উচ্ছ্বাস প্রকাশে সক্ষম হচ্ছে না, কারণ সেটা হবে তাদের দোষ। শুধু দোষ নয়, গুরুতর অপরাধ। জনগণ জানতো, এই সব দুঃস্থকে আটক করা হয়েছিলো। কে বা কারা এক জাহাজ মাল আটক করে বিলিয়ে দিয়েছিলো বস্তি এলাকার গরিবদের মধ্যে এবং সেই কারণেই তারা গ্রেফতার হয়েছিলো অপরাধী হিসেবে।

জনগণ আজ আবার নতুন ভাবে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করে কিন্তু তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। সরকারের বিরুদ্ধে টু বাক্য উচ্চারণ করার জো নেই কারও। খুশি হয়েছে জনগণও, বিস্মিতও হয়েছে, সবার মনে একই প্রশ্ন—কে সেই মহান ব্যক্তি যাঁর অসীম দয়া, যাঁর অসীম সাহস জম্বু জেল থেকে বন্দীদের মুক্ত করে এনেছে।

কিন্তু কেউ জানে না কে সে।

পত্রিকায় সংবাদ পাঠ করে সবাই নির্বাক থেকে যায়।

তবে হাজারী টিম এ সংবাদে একেবারে হক্‌চকিয়ে যায়। পুলিশমহলের অক্ষমতার জন্য তাঁরা পুলিশমহলকে নানাভাবে দোষী করে, এমনকি পুলিশ কর্মকর্তাদের চাকরি বিনষ্ট হবার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

বিশেষ করে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের টেলিফোনে পুলিশ প্রধানদের অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হলো। স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ শাসিয়ে দিলেন কেমন করে দেশে এমন অরাজকতা শুরু হলো। দুষ্কৃতিকারীরা এত সাহস পেলো কি করে যে প্রকাশ্যে তারা দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিশমহল কিছু করতে পারছে না।

জেল প্রধানের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। তিনি ব্যস্তভাবে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দুয়ারে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন যেন তাঁর চাকরির কোনো ক্ষতি

না হয়। চাকরিটা গেলে গুটিকয়েক ছেলে মেয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় পড়বেন, কাজেই তিনি চোখে সরষে ফুল দেখছেন।

❑

বনহুর তখন তার জম্বু আস্তানার বিশ্রামকক্ষে বসে রহমান ও রামসিং-য়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলো।

বললো রহমান, সর্দার, পুলিশমহলে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়েছে, বিশেষ করে স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ পুলিশমহলকে নাচিয়ে তুলছে......

বনহুর একটু হেসে বললো—ওরা তো স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাচের পুতুল, কাজেই বুঝতেই পারছো। তবে হাঁ, জেল প্রধানের চাকরিটা না খোয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখো। জেল প্রধান ব্যক্তি হিসেবে অসৎ নন, কাজেই তাঁর কোনো ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না।

রামসিং বলে উঠলো—সর্দার, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি বিরূপ হন তাহলে চাকরি তাঁর থাকতে পারে না, কারণ তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন, এটাই জেলের প্রহরীরা রিপোর্টে জানিয়েছে। জেল প্রধানের চাকরিটা যেন বিনষ্ট না হয় এটা করতেই হবে সর্দার।

হাঁ, এক্ষুণি আমি আমি জেল প্রধানের কাছে টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি তাঁর চাকরি নিয়ে কোনো বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা আছে কিনা।

বনহুর রিসিভার তুলে নিয়ে জেল প্রধানের কাছে ফোন করলেন ...হ্যালো, আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বলছি...

জেল প্রধান কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই চিনতে পারলেন, এই সেই ব্যক্তি যে তাঁকে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাসভবন থেকে জীপগাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো, চমকে উঠলেন না জানি আজ আবার কি সংবাদ সে জানাবে। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন..কি..কি বলতে চান আপনি... আপনি কে বলুন...

বনহুরের হাসির শব্দ হলো...আমি মনে করেছিলাম আপনি আমার কণ্ঠস্বর শুনলেই চিনতে পারবেন কিন্তু পারেননি...যাক, শুনুন আমি আপনার মঙ্গলকামী এক অপদার্থ ব্যক্তি। সে রাতে আমিই আপনাকে সুখশয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম...

...বলুন আজ আবার কি করতে চান?

কিছু না। কাজ আপনার শেষ তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে আবার আসবো......হাঁ, যে কারণে আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি সে কারণ হলো সে রাতের ঘটনা নিয়ে যদি আপনার উপর কোনো বিপদ্‌ আসে তবে আমাকে জানাবেন। ...আমি আপনাকে বিপদমুক্ত করবো......লিখে নিন আমার ফোন নম্বরটা......

জেল প্রধানের মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো, কারণ, টেলিফোন নম্বর পাওয়া গেলে দুষ্কৃতিকারীকে খুঁজে পেতে বিশেষ বিলম্ব হবে না। জেলপ্রধান দ্রুতহস্তে কলম-কাগজ টেনে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

বনহুর বললো......হ্যালো, লিখুন ৫৫৫০০৫......

জেলপ্রধান লিখলেন কিন্তু একি, এ যে জম্বু পুলিশ সুপারের অফিসের টেলিফোন নম্বর। জেলপ্রধান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন একেবারে।

বনহুর রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসলো, তারপর বললো— পুলিশ সুপারের অফিসের টেলিফোন নাম্বারের সঙ্গে আমাদের ঘাটির ১নং টেলিফোনের সংযোগ করে রাখবে, সেখানে যখন যে রিং হবে তা এখানেও শোনা যাবে।

আচ্ছা সর্দার। বললো রামসিং।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো—রহমান, আমি জানতে পেরেছি ঝাম সীমান্তের কাছাকাছি নাৎসায় একটি গুদামে হাজারী দলের দু'শত হাজার মণ চাউল মজুত আছে। মূল্য পাঁচশত টাকা মণ হাবার

প্রতিক্ষা করছে হাজারী দল। আমি এই চাল দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই তবে নিজের হাতে নয়, হাজারী দলকে দিয়েই বিলিয়ে দেবো......

সর্দার, কি করে তা সম্ভব হবে?

সম্ভব হবে এবং করবো।

বনহুর তুলে নিলো রিসিভার, সে ফোন করলো হাজারী বাসভবনে......হ্যালো, কে আপনি...জনাব হাজারী সাহেবকে চাই...

ওপাশে নারীকণ্ঠ......মিসেস হাজারী বলছি......তিনি শুয়ে আছেন......আপনি কে এবং কোথা থেকে বলছেন?......

বনহুর বলে......আমি আপনার স্বামীর বন্ধু......হাঁ, বন্ধু বললেই তিনি চিনতে পারবেন......আপনি দয়া করে রিসিভারটা তাঁকে দিন...

মেয়েলী কণ্ঠ......একটু ধরুন, আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি..

বনহুর রিসিভার কানে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হাজারী সাহেব শয্যায় শুয়ে ছিলেন বটে কিন্তু নিদ্রিত ছিলেন না, তিনি জেগে জেগে চিন্তাসাগরে সাঁতার কাটছিলেন।

মিসেস হাজারী স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন—ওগো, তোমার ফোন এসেছে। কোথাকার কোন্ বন্ধুর ফোন, শিগ্গির যাও ফোন ধরো।

মিঃ হাজারী বললেন—আমার বন্ধু!

হাঁ, তোমার বন্ধু, হয়তো কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি হবেন......

মিঃ হাজারী উঠে এসে রিসিভার তুলে নিলেন—হ্যালো স্পিকিং হাজারী......

......শুভ সকাল মিঃ হাজারী......

......কে...কে আপনি?......

......কেন, চিনতে পারেননি?...আপনার বন্ধু, সেই হিপ্পিতে প্রথম যার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটেছিলো আপনার এক শুভ মুহূর্তে......;

মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেলো আব্বাস হাজারীর।

স্ত্রী পাশেই ছিলেন, তিনি স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করে বিলচিত হয়ে উঠলেন, স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

হাজারী সাহেব ঢোক গিলে বললেন..কি..কি চাও তুমি...কেন তুমি আবার ফোন করেছো..আমাদের সর্বনাশ না করে তুমি স্বস্তি পাচ্ছোনা বুঝি?..

...আপনি ভুল করছেন হাজারী সাহেব, সর্বনাশ সাধন করা আমার উদ্দেশ্য নয়...উদ্দেশ্য আপনার মঙ্গল সাধনা। ...শুনুন, আগামী পরশু আপনি এবং আপনার সঙ্গে যারা টিম হিসেবে কাজ করছেন তাঁরা সবাই মিলিত হয়ে ঝাম সীমান্তে নাৎসায় যে দু'শত হাজার মণ চাল আপনারা গুদামজাত করে রেখেছেন তা দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে...যদি না দেন তবে মৃত্যু আপনার অনিবার্য..কেউ সে মৃত্যুকে রোধ করতে পারবে না...

...এ্যাঁ...এ্যাঁ...কি বললে......

ওপাশে বনহুর রিসিভার রেখে দেয়।

মিসেস হাজারী বললেন—ওগো, তোমার বন্ধু কি বলেছে?

বন্ধু! বন্ধুই বটে...দাঁতে দাঁত পিষলেন মিঃ হাজারী।

কে...কে তবে ফোন করেছিলো?

শয়তান! শয়তান সে।

কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো অতি ভদ্রলোক। আমি তাই মনে করেছিলাম কোনো...... ,

ভদ্রলোক! ভদ্রলোকই সে। জানো সে আমাদের কি সর্বনাশ করেছে? হিপ্পির প্রায় তিন কোটি টাকার মাল সে লুট করে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিলো

জম্বুর বস্তি এলাকার তিরিশ হাজার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে। আবার সে আমাদের দশ ট্রাক কাঁচামাল সীমান্ত এলাকায় আটক করে সীমান্তের গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। আবার সে আজ টেলিফোন করেছে, নৎসায় যে দু'শত হাজার মণ চাল আমরা গুদামজাত করে রেখেছি, ঐ মাল বিনামূল্যে নাৎসার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।

তা মন্দ কি বলেছে তোমার বন্ধু? তোমাকে মহৎ বুদ্ধি দিচ্ছে সে......

মহৎ বুদ্ধি! বলো কি বেগম মহৎ বুদ্ধি...

মহৎ বুদ্ধি নয় তো কি? ওগো, আমাদের তো অনেক আছে, দিলেই বা দু'শত হাজার মণ চাল বিলিয়ে?

তুমি দেখছি ঐ শয়তানটার পক্ষ অবলম্বন করছো।

কে বলে সে শয়তান? আমি বলবো সে অতি মহৎ , অতি ভদ্র, নাহলে তার মন এত বড় হয়?

খবরদার, দ্বিতীয়বার তুমি ও কথা মুখে এনো না। আমি বেটাকে উচিত শিক্ষা দেবো।

তুমি তাহলে চালগুলো বিলিয়ে দিতে চাও না?

আমার সর্বনাশ করতে চাও তুমি? হাজারী টিমের সর্বনাশ করতে চাও?

নাহলে সে যদি তার চেয়ে বেশি কোনো সর্বনাশ করে বসে?

না, না, আমি তাকে সে সুযোগ দেবো না। আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যাবো, জম্বু পুলিশ বাহিনী আমার বাড়ি ঘিরে রাখবে। সাধ্য কি সে আমাকে হত্যা করে......

কি বললে...হত্যা? তোমাকে সে হত্যা করবে...বলো কি গো?

হাঁ, আমি, যদি নৎসার গুদামে মজুত চাল নৎসার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে না দেই তাহলে সে আমাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছে......

কি জানি আমার বড্ড ভয় করছে।

মেয়েমানুষ তুমি, তাই একটুতেই ভয় পাও। জানো আমরা পুরুষ মানুষ, অমন একটুতেই ভয়ে কুঁকড়ে যাই না। জানো তো আজকাল কেউ কারও ভাল দেখতে চায় না এবং পারেও না। নিশ্চয়ই ঐ শয়তানটা আমাদের ভাল সহ্য করতে পারছে না, তাই সে আমাদের সর্বনাশ করতে উঠেপড়ে লেগে গেছে।

যা খুশি করো আমি কিছু বলবো না।

হাঁ, তুমি চুপ করে দেখে যাও শুধু, আমি কেমন সুকৌশলে কাজ করে যাই। আব্বাস হাজারী উঠে পড়লেন তক্ষুণি, তিনি ছুটবেন সুপারের অফিসে।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত ছিলো।

হাজারী সাহেব নেমে এলেন নিচে।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতে তাঁর বিলম্ব হলো না। সব কথা তিনি পুলিশ সুপারকে জানালেন এবং পুলিশ অফিসে বসেই হাজারী টিমের সঙ্গ যে সব স্বনামধন্য ব্যক্তি জড়িত আছেন তাঁদের কাছেও সকালের টেলিফোন সম্বন্ধে সব কথা জানালেন।

বিকেলে আব্বাস হাজারী সাহেবের বাসভবনে বৈঠক বসলো কিন্তু সে বৈঠক সব খোলাসা কথাবার্তা হলো না। রাত তিনটায় সবাই মিলিত হবেন বলে গোপনে সল-পরামর্শ হলো।

গভীর রাতে মিলিত হলেন হাজারী টিম।

তাঁদের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে চললো গোপন আলোচনা। তারপর বিদায়ের পালা।

সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

মিসেস হাজারী উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন, আজ স্বামী বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কে জানে।

হাজারী সাহেব তাঁর মহামান্য অতিথিদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এলেন শয়নকক্ষে। স্ত্রীকে শয্যায় বসে থাকতে দেখে কতকটা অবাক হয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন—কি আশ্চর্য, তুমি এখনও ঘুমাওনি?

ঘুমাবো! এত দুঃসংবাদের পর চোখে ঘুম আসে। কি করলে নাৎসার গুদামের চাল সম্বন্ধে...কি সিদ্ধান্ত নিলে?

চরম সিদ্ধান্ত বেগম, চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা—সমস্ত চাল গুদামে থেকে সরিয়ে ফেলার আয়োজন আমরা করেছি।

কি বললে, চাল গুদাম থেকে সরিয়ে ফেলার আয়োজন করেছো?

হাঁ।

তুমি ভাবছো সরিয়ে ফেললেই উদ্ধার পাবে?

নিশ্চয়ই পাবো। বেটা জানতেও পারবে না চালগুলো কোথায় গেছে। দশ বিশ মণ মিছামিছি বিলিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেবো সব দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি।

তোমার কি মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই?

কেন, কি হয়েছে?

যে ব্যক্তি স্বপ্নের মত সব জানে তোমাদের—কোথায় তোমরা কি রেখেছো, কোথায় তোমরা কি করছো...আর গুদাম থেকে দু'শত হাজার মণ চাল রাতারাতি সরিয়ে ফেলবে, এটা সে জানতে পাবে না, বলো কি?

কৌশলে বেগম, কৌশলে কাজ করবো আমরা। সে কেন, গুদামের পাহরাদার পর্যন্ত জানবে না মাল কোথায় যাচ্ছে। সবাই মনে করবে মালগুলো দুঃস্থ জনগণের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি কিংবা বিলিয়ে দেবার জন্য......

জানি তোমরা শিয়ালের মত ধূর্ত তবু আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে তোমার কোনো অমঙ্গল না হয়।

তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও বেগম—যা করতে হয় হাজারী টিম করবে, যা ভাবতে হয় হাজারী টিম ভাববে, বেগম, হাজারী টিম কারা জানো না, তারাই দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

❑

বিধাতাদের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে রহমান। ঐ যে কথায় বলে প্রদীপ নিভে যাবার পূর্বে একবার দপ দপ করে জ্বলে উঠে। তেমনি দেশের যারা শত্রু, সর্বনাশের যারা মূল, যাদের জন্য আজ দেশে এত অশান্তি, সেই মুনাফাকারী চোরাচালানী অসৎ ব্যাবসায়ীদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু আমি নই, দেশের জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না করতে পারে না। একটু থেমে বলে বনহুর—বলো কি সংবাদ?

সর্দার, সমস্ত চাল রাতের অন্ধকারে পার করতে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি, না পারায় গুদামের সব চাল জম্বু নদীতে ফেলে দিয়েছে......

বলো কি রামসিং! বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বললো রামসিং—দুঃস্থ জনগণকে বিলিয়ে দেবার ভয়ে ওরা এই কাজ করছে সর্দার।

দু'শত হাজার মণ চাল ওরা রাতের অন্ধকারে নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়েছে! এমন কাজ ওরা করলো...মানুষ নয় ওরা জানায়োর ......;বনহুর ক্ষিপ্তের মত মাথার চুলগুলো এলোমেলোভাবে টানতে লাগলো।

রহমান বলে উঠলো—এরা জানোয়ারের চেয়েও অধম সর্দার, নাহলে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুনাফার ইমারত গড়ে তোলে। এত চাল নদীর বুকে নিক্ষেপ করলো! তাতে তাদের মন একটুও বিচলিত হলো না?

বিচলিত হবে ঐ নরপশুদের মন? ওদের মন বা বিবেক বলে কিছু আছে? যদি থাকতো তবে এতবড় অমানুষিক কাজ তারা করতে পারতো না। রহমান, শুধু এ দেশেই নয়, নরপশু মুনাফাকারীদল সব দেশেই এই ধরনের কাজ করে চলেছে। ওরা কোটি কোটি টাকার মাল দেশ থেকে পাচার করছে দেশের বাইরে। হঠাৎ যদি কোনো সময় ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে বা হয় তাহলে গোপনে রাতের অন্ধকারে ওরা হাজার হাজার মণ খাদ্যসামগ্রী নদীগর্ভে তলিয়ে দেয়। তবু নরপিশাচের দল দেশের জনগণের মুখে সে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেবে না।

হাঁ সর্দার, স্বার্থান্ধ পশুরা তাই করে থাকে।

রহমান, আব্বাস হাজারীর সঙ্গে আজই আমি সাক্ষাত করবো এবং এত চাল তারা কেন বিনষ্ট করলো জিজ্ঞাসা করবো।

সর্দার!

বলো রামসিং?

ঝাম থেকে আলী হায়দার এসেছে—একটি সংবাদ সে এনেছে।

ডেকে আনো তাকে।

রামসিং বেরিয়ে যায় এবং একটু পরে আলী হায়দার সহ প্রবেশ করে সেখানে।

আলী হায়দার কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার, একটি জরুরি সংবাদ।

বলো'?

ঝাম সীমান্তের কাছাকাছি ইরামতী নদীতে একটি বড় নৌকা আমরা আটক করেছি সর্দার। নৌকায় প্রায় দশ লাখ টাকার খাদ্যশস্য রয়েছে। ইরামতী থেকে ঐ নৌকাখানা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, কারণ পুলিশ বাহিনী ইরামতীর ধার দিয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে, যেন কেউ কোনো খাদ্যশস্য দেশ থেকে সীমান্তের ওপারে পার করতে না পারে, অথচ......

অথচ দিব্যি এসব চোরাচালানী নৌকা আরামে সীমান্ত এলাকা পার হয়ে চলে যাচ্ছে, কারণ পুলিশ মহল জানে, এ মাল কার এবং কোথায় যাচ্ছে। কাজেই তারা দেখেও না দেখার ভান করে চলেছে, এই তো?

হাঁ সর্দার, সীমান্ত এলাকায় এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা সত্ত্বেও এ কারণেই চোরাচালানীদল দিব্যি এপারের মাল ওপারে নিয়ে গিয়ে মোটা মুনাফা লুটছে। কারও সাধ্য নেই এসব চোরাচালানীকে পাকড়াও করে, কারণ তারা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পণ্যদ্রব্যের বাহক। আমরা আটক করেছি কিন্তু সেই আটক মালসহ নৌকা প্রকাশ্য হটাতে পারছি না।

নৌকার মাঝিমাল্লাদের কি করেছো?

তাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে নৌকার তলায় শুইয়ে রেখেছি। সর্দার?

বলো?

আমরা নৌকাখানিকে ইরামতীতে ডুবিয়ে দিতে চাই, কারণ কোনোক্রমে নৌকাখানা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে আনা যাবে না।

আলী হায়দার খবরদার এমন কাজ কোনোদিন করো না। দেশের সম্পদ কোনোদিন বিনষ্ট করো না। মনে করো কোনো এক মুনাফাকারীর প্রতি তোমরা ক্রুদ্ধ হলে, তাকে তোমরা যা খুশি করতে পারো কিন্তু তার মজুত মাল নষ্ট করতে পারো না। যা নষ্ট করবে, ধরো যদি আগুন ধরিয়ে দাও কিংবা পানিতে ডুবাও তাতে দেশের এবং দশের ক্ষতি, কাজেই তোমরা এ ব্যাপারে সদা সজাগ থাকবে।

সর্দার, আপনার আদেশ শিরোধার্য। তবে কি করবো সেই মালবোঝাই নৌকাখানার?

রহমান এবং রামসিং সহ তোমরা সেই নৌকায় চলে যাও। মাঝিদের পোশাক পরে ছদ্মবেশে নৌকাখানা ঝাম এলাকায় নিয়ে এসো, তারপর বিলিয়ে দাও জনসাধারণের মধ্যে। পুলিশ বাহিনী তোমাদের সন্ধান পাবার পূর্বেই তোমরা সরে পড়বে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো বনহুরের পায়ের কাছে।

চমকে উঠলো বনহুর, রহমান, রামসিং ও হায়দার আলী। বনহুর ছোরাখানা তুলে নিতেই দেখলো ছোরার বাঁটে একটি কাগজের টুকরো বাঁধা রয়েছে।

বনহুর চিঠিখানা খুলে নিলো ছোরার বাঁট থেকে, মেলে ধরলো চোখের সামনে। চিঠিতে লিখা আছে মাত্র কয়েক লাইন—

আমি জানতাম তুমি আমায় বন্দী করে রাখতে
পারবে না, কারণ কেউ আমাকে কোনোদিন
পারেনি বন্দী করে রাখতে। বনহুর, তোমার
জম্বু আস্তানার সন্ধানও আমি পেয়েছি। তবে
তোমার কোনো অসুবিধা করবো না। রক্তে
আঁকা ম্যাপের মায়া তুমি ত্যাগ করো।

—দস্যুরাণী